

ଆ|ଗ|ମ|ନୀ ୨୦୨୬



କାନ୍ଧିତ ହୃଦ



সন্দর্শন
আগমনী ২০২৬
শারদীয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি বার্ষিকী

সম্পাদক: শিবাজী লাহিড়ী
প্রকাশক: কাশ্মীরা লাহিড়ী

প্রকাশনার ধরন: ই-পত্রিকা
প্রকাশকাল: শারদীয়া ২০২৬
ভাষা: বাংলা

ফোন নাম্বার- ৯৪৩৪৮৭৮১০৮, ৯৪৩৪২৫১৯৯৩

ওয়েবসাইট: sandarshanepaper.wordpress.com

যোগাযোগ: sandarshan.magazine@gmail.com

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কার্যালয়: মঙ্গলবাড়ী, ওল্ডমালদা রোড, ওসমানিয়া হাই মাদ্রাসার
সামনে, পিন- ৭৩২১৪২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: শমিত দত্ত

স্বত্ব: © সন্দর্শন, ২০২৬। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

UDYAM-WB-011-0097957

Applied for e-ISSN vide application no. 76157 dated 22/08/2026

এই সংস্করণের কোনও মুদ্রিত মূল্য নেই

সূচিপত্র



১) কবিতা “আশ্বিন”	অমিতাভ প্রামাণিক	১
২) ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নাম যে কারণে অপরিবর্তনীয়	বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়	২
৩) “শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ”: মহামায়ার সংসার	দীপাঞ্জনা শর্মা	৬
৪) হিমালয় আর যাত্রীর কথোপকথন	দেবব্রত কর বিশ্বাস	৮
৫) ফরাসী উপনিবেশে “অনুশীলন” যোগসূত্র: চন্দননগরের শেঠ বাড়ির দুর্গাপূজো	অন্তরা মুখার্জি	১১
৬) নারীশিক্ষায় ভারতের বদলে যাওয়ার মানচিত্র	সঞ্জমিত্রা গোস্বামী	১৪
৭) কবিতা “অপেক্ষা” ও “দিনগুলি মোর	নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
৮) রূপালি রায়খরের সোনালী স্বপ্ন	সন্দীপন তালুকদার	১৮
৯) বন্দেমাতরমের বন্দে মাতরম ও দুর্গা ভাবনা	সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়	২১
১০) কমিকস শান্তির খোঁজে	শমিত দত্ত	২৩
১১) ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ: অতল গহ্বরে প্রাণের টিকে থাকার অবিশ্বাস্য লড়াই	সৌমিক আগরওয়াল	২৬
১২) বিস্মৃত আলোকচিত্রী অমিয় তরফদার	ঋষি ঘোষ	৩১
১৩) কবিতা “সুস্বাদ এক অন্ধকার” ও “দূরত্ব”	ইমন ভট্টাচার্য	৩২
১৪) “কেউ নেই শূন্যতা”-র জাদুকর	শিবাজী লাহিড়ী	৩৩

সম্পাদকের কথা

শারদপ্রভাতের আলোয় যখন প্রকৃতি নতুন করে সেজে ওঠে, যখন আগমনী সুরে মুখরিত হয় চারপাশ, তখন আমাদের মনও ফিরে তাকায় শিকড়ের দিকে। দুর্গাপূজো কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়; বাঙালির সামাজিক জীবন, শিল্পবোধ, সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক। এই উৎসবের আনন্দের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার, চারপাশকে অন্য চোখে দেখার এবং সময়কে বুঝে নেওয়ার সুযোগ। সেই উপলব্ধি থেকেই সন্দর্শন—এর শারদীয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি বার্ষিকী ‘আগমনী ২০২৬’—এর এই আয়োজন।

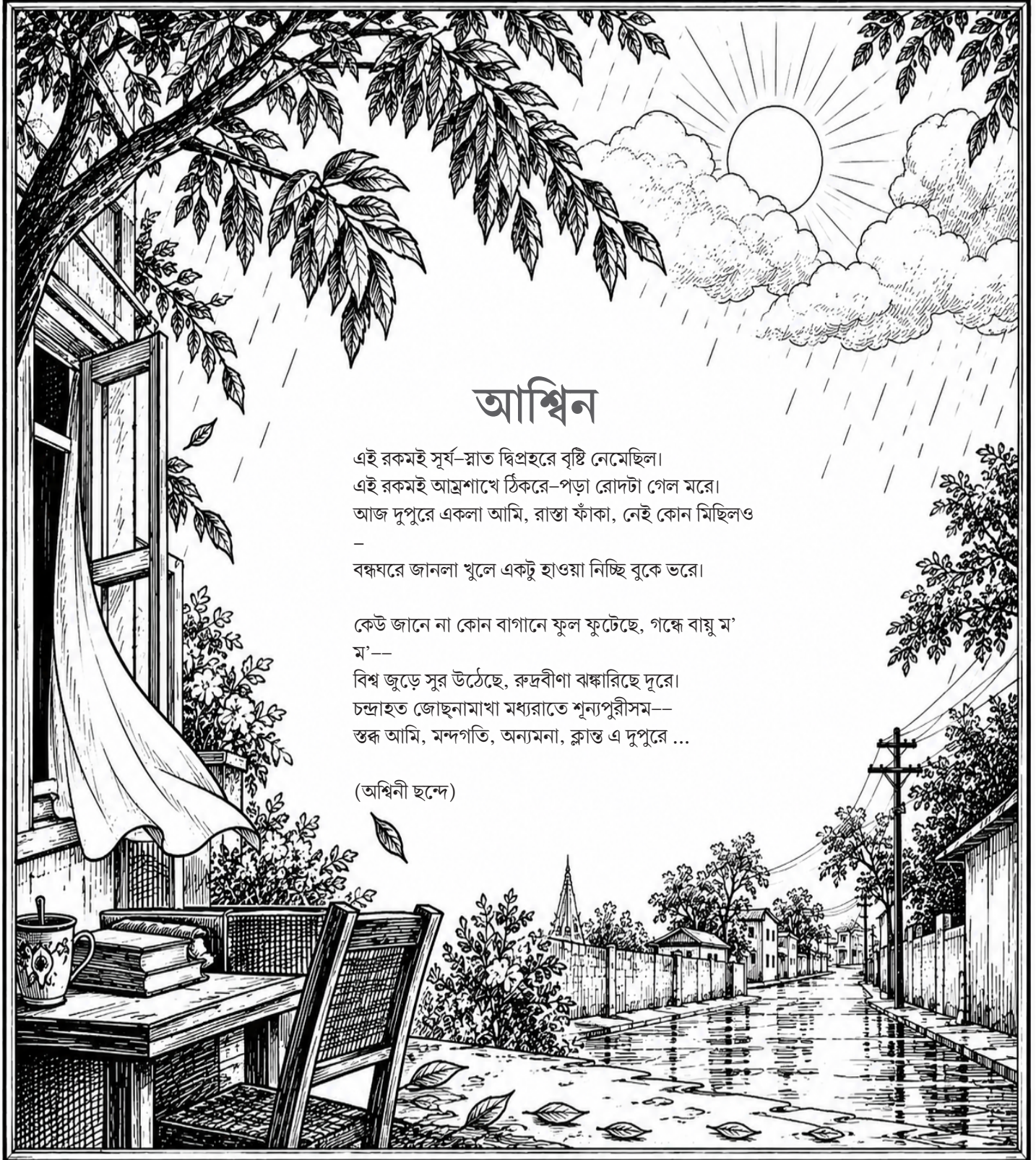
আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন তথ্যের প্রাচুর্য রয়েছে, অথচ গভীরভাবে ভাবার অবকাশ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। প্রতিদিন অসংখ্য খবর, ছবি ও মতামত আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। কিন্তু সেই বিপুল তথ্যের মধ্যে কতটা আমাদের চিন্তাকে প্রসারিত করে? কতটা আমাদের প্রশ্ন করতে শেখায়? সাহিত্য ও সংস্কৃতির দায়িত্ব এখানেই—পরিচিত জগতের ভিতরেও অপরিচিতকে খুঁজে পাওয়া, প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করা এবং মানুষের অভিজ্ঞতাকে নতুন আলোয় দেখা।

ইতিহাস বীক্ষণের চিন্তাকে মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গের নামের যে তাৎপর্য, তার সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করা একটি দায়। সমগ্র বাঙালীর। সেই দায়কে মনে করিয়ে দিয়ে কবিতাগুলির মধ্যে যে শূন্যতার উদযাপন, তাকে ঘিরে শুরু হয়েছে আমাদের এই আগমনী সংখ্যা। কারণ শূন্যতা উদযাপনের বিষয় হলেও, ঐতিহাসিক অন্ধকার, আমাদের দৈন্য করে। ‘শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ’—এই শিরোনামটিই যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শূন্যতা মানেই অনুপস্থিতি নয়; নীরবতারও নিজস্ব ভাষা আছে, স্থিরতার গভীরেও চলতে পারে অদৃশ্য তরঙ্গ। কবিতার কাজ হয়তো সেই অদৃশ্য আন্দোলনকে অনুভবযোগ্য করে তোলা। আবার হিমালয় ও যাত্রীর কথোপকথন আমাদের সামনে হাজির করে পথ, প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক

সম্পর্কের প্রশ্ন। যাত্রা এখানে শুধু গন্তব্যে পৌঁছানোর উপায় নয়, নিজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ারও এক অবিরাম প্রক্রিয়া। ইতিহাসের দিকে তাকানোও আমাদের বর্তমানকে বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। চন্দননগরের শেঠ বাড়ির দুর্গাপূজো এবং তার সঙ্গে ফরাসি উপনিবেশ ও ‘অনুশীলন’—এর যোগসূত্রের অনুসন্ধান আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, উৎসবের ইতিহাস কখনও একমাত্রিক নয়। তার ভিতরে মিশে থাকে রাজনীতি, সমাজ, স্থানীয় উদ্যোগ এবং বৃহত্তর ইতিহাসের নানা প্রবাহ। একইভাবে ‘বন্দেমাতরম’ ও দুর্গাভাবনার আলোচনা আমাদের জাতীয়তাবাদ, প্রতীক এবং সাংস্কৃতিক কল্পনার সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবতে আহ্বান জানায়। অতীতকে স্মরণ করার অর্থ কেবল গৌরবের পুনরাবৃত্তি নয়; তার জটিলতাকেও বোঝার চেষ্টা। এই বার্ষিকীতে নারীশিক্ষা নিয়ে আলোচনার উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একটি সমাজের পরিবর্তনকে বিচার করতে হলে তার নারীদের শিক্ষা, স্বাধীনতা ও সামাজিক অংশগ্রহণের পরিসরকে দেখতে হয়। শিক্ষা শুধু কর্মসংস্থানের পথ খুলে দেয় না, মানুষের বিচারবোধকে শক্তিশালী করে, আত্মমর্যাদা গড়ে তোলে এবং সমাজকে আরও ন্যায়সংগত করে তোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। উন্নয়নের যে কোনও আলোচনা তাই মানুষের সমান সুযোগ ও মর্যাদার প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে পারে না। অন্যদিকে, রূপালি রায়খরের সোনালী স্বপ্ন, বিস্মৃত আলোকচিত্রী অমিয় তরফদারকে ফিরে দেখা কিংবা ‘শান্তির খোঁজে’ কমিকসের মতো রচনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সংস্কৃতির পরিসর বহুমাত্রিক। কোনও শিল্পীকে স্মরণ করা মানে শুধু তাঁর কাজকে উদ্ধার করা নয়; আমাদের সাংস্কৃতিক স্মৃতির কোন অংশগুলি সময়ের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলা। আর শান্তির অনুসন্ধান আজও জরুরি—ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে এবং বৃহত্তর পৃথিবীতে। বিজ্ঞানের বিস্ময়ও এই সংখ্যার ভাবনাকে প্রসারিত করেছে। ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের অতল

গভীরে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও প্রাণের টিকে থাকার লড়াই আমাদের পৃথিবীর অজানা সম্ভাবনার কথা জানায়। মহাবিশ্ব ও প্রকৃতিকে জানার এই কৌতুহল মানবসভ্যতার অন্যতম চালিকাশক্তি। সাহিত্য যেমন মানুষের অন্তর্জগৎকে অনুসন্ধান করে, বিজ্ঞান তেমনই পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে বহির্জগতের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করে। পথ আলাদা হলেও উভয়ের ভিতরেই রয়েছে প্রশ্ন করার সাহস এবং অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা। আগমনী ২০২৬ কোনও একটি বিষয় বা মতের মধ্যে পাঠককে আবদ্ধ রাখতে চায় না। বরং কবিতা থেকে ইতিহাস, সমাজ থেকে বিজ্ঞান, স্মৃতি থেকে সমকাল—বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ খুঁজে নেওয়ার একটি পরিসর তৈরি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা বিশ্বাস করি, একটি সার্থক সাহিত্য-সংস্কৃতি বার্ষিকী কেবল পাঠের উপাদান সরবরাহ করে না; পাঠকের মনে নতুন প্রশ্নও জাগিয়ে তোলে। এই ডিজিটাল প্রকাশনার যাত্রায় আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, আবার রয়েছে সম্ভাবনাও। প্রযুক্তি আমাদের প্রকাশনার পরিসর বাড়িয়েছে, পাঠকের কাছে পৌঁছানোর নতুন পথ খুলে দিয়েছে। কিন্তু মাধ্যমের পরিবর্তন সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর গুণমান, চিন্তার স্বাধীনতা এবং সৃজনশীলতার প্রতি দায়বদ্ধতার গুরুত্ব অপরিবর্তিত। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই সন্দর্শন—এর এই উদ্যোগ। এই সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত সকল লেখক, কবি, শিল্পী ও সহযোগীর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাঁদের সৃজনশীল অংশগ্রহণ ছাড়া এই আয়োজন সম্ভব হত না। আর পাঠকদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা—লেখাগুলিকে শুধু পড়বেন না, তাদের সঙ্গে সংলাপে অংশ নেবেন; কোথাও সহমত হবেন, কোথাও প্রশ্ন তুলবেন, কোথাও নতুন ভাবনার সূত্র খুঁজে পাবেন। শারদীয়ার আনন্দ আমাদের হৃদয়কে উদার করুক, আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করুক। উৎসবের আলো যেন কেবল বাহ্যিক সাজসজ্জায় সীমাবদ্ধ না থেকে পৌঁছে যায় মনন, মানবিকতা ও মুক্তচিন্তার গভীরে।

অমিতাভ প্রামাণিকের কবিতা



অশ্বিন

এই রকমই সূর্য-স্নাত দ্বিপ্রহরে বৃষ্টি নেমেছিল।
এই রকমই আত্মশাখে ঠিকরে-পড়া রোদটা গেল মরে।
আজ দুপুরে একলা আমি, রাস্তা ফাঁকা, নেই কোন মিছিলও
—
বন্ধঘরে জানলা খুলে একটু হাওয়া নিচ্ছি বুকে ভরে।

কেউ জানে না কোন বাগানে ফুল ফুটেছে, গন্ধে বায়ু ম’
ম’—
বিশ্ব জুড়ে সুর উঠেছে, রুদ্রবীণা বাজারিছে দূরে।
চন্দ্রাহত জোছনামাথা মধ্যরাতে শূন্যপুরীসম—
স্তব্ধ আমি, মন্দগতি, অন্যমনা, ক্লান্ত এ দুপুরে ...

(অশ্বিনী ছন্দে)

‘পশ্চিমবঙ্গ’ নাম যে কারণে অপরিবর্তনীয়

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

“গাছ বড় হয়ে যাওয়ায় অক্ষরগুলি আরও বড় হয়ে গেছে। যেন দেশের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই অক্ষরগুলি যতদিন যাবে তত বড় হয়ে যাবে। বাংলাদেশের মানুষ বড় বড় হরফে পড়বে, জ্যাঠামশয় আমরা হিন্দুস্তানে চলিয়া গিয়াছি— ইতি সোনা।”

(নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজেঃ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়)

“কথাটা বলেছিল মাকরেল ক্যাম্পের ছিনাথা। শ্রীনাথ মালাকার।... তার বক্তব্যঃ আঞ্জে বাবুমশয়, পেরথমে তো ক’ন নাই, যে বিচারে আমাদের অরণ্যদণ্ড হইছে।... কারাদণ্ডের চিনি, মিত্যদণ্ডও না চিনি তা নয়, কিন্তুক এমন অরণ্যদণ্ড দিবার ব্যবস্থা হইছে, তা তো ক’ন নাই।”

(অরণ্যদণ্ডকঃ নারায়ণ সান্যাল)

“... হিন্দুর মেয়ের পুকুরঘাটে স্নান করতে যাওয়া আর সম্ভব নয়।... হিন্দুর মেয়েরা ঘাটে স্নান করতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক পাড়ে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে বয়সে নবীন যুবক যেমন আছে, তেমন বয়সে প্রবীণ প্রৌঢ়ও আছে।... তারা ছড়া কেটে গান ধরে। এক পাড়ের লোক গায়ঃ— ‘পাক পাক পাকিস্তান;’ আর অন্য পাড়ের লোক বলে, —‘হিন্দুর ভাতার মুসলমান’। এই অদ্ভুত আচরণে যে মেয়েটি স্নান করতে জলে নেমেছে সে স্বভাবতই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। নির্যাতিতকারীদের মনে তার সেই আচরণ ভারী কৌতুকবোধ জাগায়। তারা হেসে কুটিকুটি হয়। এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে না।... ঘাটের দিকে একজন প্রৌঢ় পুরুষ এগিয়ে এসে বলে, ‘ও বিবি, বেলা যে বেড়ে চলল। আর দেরি কেন? এবার ঘরে চলো’।

সে কথা শুনে মেয়েটি ভয়ে আরও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। আবার ওদিকে হাসির ছল্লোড় বয়ে যায়। তখন সেই প্রৌঢ়... এক নবীন সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলেঃ ‘ওরে তোর চাচির পায়ে বুঝি খিল ধরেছে। উঠতে কষ্ট হচ্ছে। হাত ধরে তুলে নিয়ে আয় না।’

(উদ্বাস্তঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়)

“এক হাজারেরও বেশি উদ্বাস্তর অস্থায়ী বাসস্থান শিয়ালদহ স্টেশন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভ্যান এসে প্রতিদিন ৩০০ উদ্বাস্তকে আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যায়। নতুন উদ্বাস্তর দল এসে তাদের শূন্যস্থান পূরণ করে।... উদ্বাস্তদের পোটলা-পুটলি, নোংরা বিছানাপত্র প্ল্যাটফর্মের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এত মানুষ এভাবে গাদাগাদি করে থাকায় প্ল্যাটফর্মের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়েরিয়া, বদহজম ও আমাশয় দেখা দিয়েছে।... মধ্যবিত্ত হিন্দুরা কলকাতা ও শহরতলীর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তাদের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, দিনমজুর এবং নিম্নমধ্যবিত্ত দোকানদার স্টেশন প্ল্যাটফর্মে সরকারি আশ্রয়শিবিরে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে।”

(স্টাফ রিপোর্টারঃ ইউপিআই)



“এই মানুষ বিনিময় এমন একটি জিনিস যা সম্পূর্ণভাবে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আর্থিক নীতির বিরোধী। তার সঙ্গে আরও একটি নীতি জড়িত আছে। তা হল আমাদের বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্ন।”

(জওহরলাল নেহরুঃ লোকসভায় দেওয়া বক্তব্য, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫০)

“পাণ্ডিত নেহেরু যখন পাঞ্জাবে মানুষ বিনিময়ের ব্যবস্থা নিজেই করেছিলেন, তখন তাঁর এই বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্নটিকে ঠান্ডাঘরে বন্ধ রেখেছিলেন মনে হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাঁর উচিত হবে বিশ্বাসভঙ্গের প্রশ্নটিকে ঠান্ডাঘরে আবদ্ধ রেখে অভিজ্ঞ রাজনীতি বিশারদদের মতো বাস্তবের সম্মুখীন হওয়া।”

(ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ঃ লোকসভায় নেহেরুর কথার উত্তরে রাখা বক্তব্য, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫০)

“১৯৫০-এর প্রথমদিকে কলকাতায় খবর এল যে পূর্ববঙ্গের খুলনা, বরিশাল ও অন্যান্য জেলায় নমঃশূদ্রদের ওপর হিংস্র অত্যাচারের ফলে অসংখ্য মানুষ চলে আসছে। কিন্তু এবার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসাও সহজ হয়নি। হাজার হাজার উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গের রেলস্টেশন, স্টিমারঘাট ও ঢাকা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে লাগল। পূর্ব-পাকিস্তান সরকার তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থা করেনি। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির অপেক্ষা না করেই ডাঃ রায় এই মৃত্যুপথযাত্রী মানুষগুলিকে বাঁচাবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে আসার জন্য ১৬টি ভাড়াটে বিমান অবিলম্বে কাজে লাগালেন। ফরিদপুর, বরিশালের স্টিমারঘাটে যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু মৃত্যুর দিন গুনছিল তাদের নিয়ে আসার জন্য পনেরোটি যাত্রীবাহী স্টিমার পাঠালেন। হিন্দুরা যখন পালিয়ে আসছে তখন পথেই তাদের খুন করা হচ্ছে, এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল।”

(প্রান্তিক মানবঃ প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী)

“একদিন সন্ধ্যাবেলা রাইটার্স থেকে ফিরে ডাঃ রায় জানতে পারলেন যে বনগাঁ সীমান্ত থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে যে গাড়ি এসেছে, তার কয়েকটি কামরায় যাত্রী ছিল না; ছিল মেয়েদের হাতের বালা ও শাঁখার ভাঙা টুকরো, হেঁড়া শাড়ি ও রক্তাক্ত মানুষের মৃতদেহ। ডাঃ রায় তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। আমরা যারা একতলায় ছিলাম তারাও ফোনে ডাঃ রায়ের উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলছিলেন যে... যুদ্ধ ছাড়া এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না। তাঁর ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়েছে।”

(সরোজ চক্রবর্তীঃ With Dr. B.C.Roy and other Chief Ministers)

“আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করেছেন যে ১৯৪৮-এর জুলাই মাসের শেষ নাগাদ সাড়ে এগারো লাখ মানুষ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে এসেছে। এই উদ্বাস্তু প্রবাহ শেষ হয়নি... দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েও এই উদ্বাসন কখনও থামার সম্ভাবনা আছে বলে তো মনে হয় না; বছরের পর বছর আসবে

এবং প্রতিদিন পূর্ববঙ্গ থেকে... লোক চলে আসবে..."

(স্যর যদুনাথ সরকারঃ ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে দেওয়া ভাষণের অংশ)

“১৯৬০-৬১তে বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়ে যায়। ১৯৬১-৬৫-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ১০লক্ষ উদ্বাস্তু চলে আসে। ১৯৬২তে পাবনা ও রাজশাহিতে এবং ১৯৬৪ ও ১৯৬৫তে ঢাকা ও অন্যান্য এলাকায় ব্যাপকভাবে হিন্দু সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হয়। তারই ফল বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা। মন্ট্রিয়েলের টাইমস ইনক এর কানাডীয় সংবাদদাতা এ বিষয়ে তাঁর যে প্রতিবেদন পাঠান তা হল, ‘এই ধ্বংসলীলার ফলে একমাত্র ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকায় প্রায় ১০হাজার লোক গৃহহীন হয়েছিল; অসংখ্য হিন্দুর ঘড়বাড়ি ভাঙীভূত করা হয়েছিল। যেসব পুড়িয়ে দেওয়া হিন্দু বাড়ির মাটির দেওয়াল তখনও দাঁড়িয়ে ছিল তাদের গায়ে কালি দিয়ে উর্দুতে লিখে দেওয়া হয়েছিল, “এই বাড়ি মুসলমানের”। শত শত আহত মানুষকে খোলা ট্রাকে ঢাকার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। বিদেশি ডাক্তাররা স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সহায়তার জন্য তাদের প্রসারিত হাত ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই পাশব হত্যাকাণ্ডের ওপর লৌহ যবনিকা ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

“...পূর্ব পাকিস্তান যখন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হল তখন অনেক কিছুই হয়তো পালটাল। পালটাল না শুধু হিন্দুদের চলে আসাটা।... মুজিব নিহত হলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হল। বাংলাদেশ ইসলামি রাষ্ট্র হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের চেহারা নিল। হিন্দুদের চলে আসার প্রক্রিয়া আবার শুরু হল। এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। এখন আর শুধু হিন্দু নয়, খৃষ্টান ও বৌদ্ধদেরও বাংলাদেশ থেকে বিতাড়ন পর্ব চলছে।”

(প্রান্তিক মানবঃ প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী)

এত উদ্ধৃতির পর প্রতিবেদকের আর বিশেষ কিছুই বলার থাকে না। তবু যেটুকু বলতেই হয় তা হল মুক্তচিন্তার স্রোতকে ক্রমাগত কোনঠাসা করে বাংলাদেশে বিপুল শক্তিবৃদ্ধি করে চলেছে ভয়ংকর মৌলবাদী শক্তি যা আইসিস এবং তালিবানের দোসর। এদের বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে হুমায়ূন আজাদ থেকে অভিজিৎ রায় খুন হয়েছেন, খুন হয়েছেন অসংখ্য মুক্তচিন্তক এবং

বাকিরাও প্রতিনিয়ত আতঙ্কে রয়েছেন। আর এর পাশাপাশি খালেদা কিংবা হাসিনা হয়ে ইউনুস কিংবা তারেক রহমানের আমলেও নিরন্তর খুন হয়ে চলেছে হিন্দুরা। হয়েই চলেছে। তবু এরই মধ্যে অনবদ্য কাজ করছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এবং তাঁর সহযোগীরা। একান্তরের আগে-পরে বাংলাদেশের অজস্র এলাকায় যে একের পর এক গণহত্যা ঘটিয়েছিল পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ও রাজাকাররা মিলে তারই এক প্রামাণ্য ইতিহাস তুলে ধরছেন তাঁরা, তাঁদের ‘গণহত্যা-নির্যাতন নির্ধর্ত গ্রন্থমালা’য়। হাড়হিম করা সেইসব বইয়ে দেখতে পাচ্ছি চুকনগর গণহত্যায় একদিনে খুন করা হয়েছিল অন্তত দশহাজার মানুষকে যাদের সংহতগ সংখ্যালঘু হিন্দু। শুধু চুকনগর কেন, দেয়াড়া, কালীগঞ্জ, গোলাহাট, লালমাটিয়া, কাঠিরা... প্রায় সর্বত্র পশ্চিমবাংলায় পালিয়ে যাবার জন্য জড় হওয়া হিন্দুদের ওপর নেমে এসেছে অকথ্য নির্যাতন। মামুন সম্পাদিত গ্রন্থমালায় পড়ছি, “হত্যা-নির্যাতনের গতিপ্রকৃতি একই রকম। দলবদ্ধভাবে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে লুট-আগ্নিসংযোগ এবং হত্যা-নির্যাতন শেষে ধর্ষণ দিয়ে শেষ হয়েছে অপারেশন।” এই গ্রন্থমালায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে চাঁদপুর পৌরসভার ডোম ব্রজনাথ বলেন, “... রক্তাক্ত মৃত্যুর স্তূপ দেখিয়ে পাকিরা বলত, ইয়ে জলদি সাফ করো। ... সারারাত ধর্ষণের পর ভোরবেলা মহিলাদের মালগাড়ির ওয়্যগনে ঢুকিয়ে বাহির থেকে তালা মেরে রাখত এবং পরবর্তী রাতে আবার ক্যাম্প নিয়ে ধর্ষণ করত।”

ভুলে যাব? সব ভুলে যাব? ভিয়েতনামে আমেরিকার নৃশংসতার বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন আমার বাবা, গুজরাত দাঙ্গার পর রাস্তায় নেমেছি আমি নিজে। কিন্তু অবাধ হয়ে লক্ষ্য করেছি এই বাংলায় এক অদ্ভুত সাংস্কৃতিক ভণ্ডামির আমদানি করেছেন দেওয়ালের কিছু অনুপ্রাণিত তান্ত্রিক। এরা সর্বাত্মেই চিন এবং পাকিস্তানের মানসপুত্র কারণ তিয়েন-আন-মেনে হাজার-হাজার মানুষ মারা গেলে এরা প্রতিবাদ করেন না, সিঁধু কিংবা বালুচে অসংখ্য হত্যার পর কুলুপ আঁটা থাকে এদের মুখে। যাদবপুর থেকে দুর্গাপুরের ঘরে ঘরে কিউবার জন্য চাল সংগ্রহ করার সময় এদের মনের ত্রিসীমানাতেও উঁকি দেয় না কুপার্স ক্যাম্প বা ধুলিয়ায় কিংবা পশ্চিমবঙ্গের হাজারও জায়গায় রেললাইনের ধারে, ফুটপাথে ঝুপড়িতে কিংবা খোলা আকাশের নিচে বাংলা ভাষায় কাতরানো

উদ্বাস্তু মা-ভাই-বোনের মর্মস্পর্শ যন্ত্রণা।

সদার বল্লভভাই প্যাটেল এদের সম্পর্কেই একটি চিঠিতে বলে গিয়েছিলেন যে কিছু সোনা দিয়ে কেবল ছুরিই বানানো সম্ভব। কাশ্মীর নিয়ে ঝামেলায় বিশ্বের দরবারে নিজেকে প্রগতিশীল দেখানোর জন্য কোটি-কোটি বাঙালির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন যে নেহেরু (পাঞ্জাবের জনবিনিময় বাংলায় হতে না দিয়ে) এরা সেই নেহেরুরই স্যাণ্ডা। প্যাটেল বর্ণিত ছুরি হয়েই স্বাধীনতার আগে এবং পরে এরা ভারতকে খণ্ড-খণ্ড করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কখনও ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’ এর দাবিকে সমর্থন করে, কখনও বা ‘চিনের চেয়ারম্যান’কে নিজেদের চেয়ারম্যান দাবি করে।

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে ‘বাংলা’ রাখার চেষ্টা সেই চক্রান্তেরই একটি অংশ যা পূর্বতন রাজ্য সরকারকেও গেলাতে সক্ষম হয়েছিলেন এই মতাবলম্বীরা। তাঁদের আজ্ঞাবহ কিছু ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের কাছে জানতে সাধ হয়, এতই যখন সম্প্রীতি তখন আপনারা কেন ওপার থেকে পালিয়ে এপারে এসে আছেন? ওপারে গিয়ে নিজেদের ‘ভিটের’ বসে শিল্প-সাহিত্যচর্চা করুন না! আসলে কেউ-কেউ নিজেদের শিকড়কে অস্বীকার করতে চান। তাই সিঙ্গার, সল বেলা কিংবা মালামাড অথবা ফিলিপ রথের মতো বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকরা যখন নিজেদের ইহুদি পরিচয় গোপন না করে ‘হলোকাষ্ট’ এর যন্ত্রণা নিয়ে লিখেছেন, লিখে গেছেন তখন ওই বঙ্গীয় তালেবরদের লেখা পড়লে মনে হয় পূর্ববঙ্গ থেকে পিকনিক করতে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল, কোটির ওপরে মানুষ। আর তারপর সেই পিকনিক স্পটেই থেকে গেছে। বৃহত্তর বাংলাদেশ তৈরির যে চেষ্টা চলছে খাগড়াগড় এবং মালদা-মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গাকে কেন্দ্রে রেখে, তা যদি সফল হয় তাহলে নতুন পিকনিক স্পটের সন্ধানে বেরোতে হবে এখানকার বাঙালিকে। রাঁচি কিংবা কটকের রেলস্টেশনে চট বিছিয়ে শোয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে, ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে এগোতে হবে। এগোতে হবে, এই কথা মাথায় রেখেই যে ইতিহাসের রাক্ষস পুনর্জীবন লাভ করেছে। আজকের বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত হিন্দু-বৌদ্ধ খুন যেভাবে গণহত্যার দিকে এগোচ্ছে, দীপু দাসকে পুড়িয়ে মারা কিংবা গণপতি চক্রবর্তীর পুরো পরিবার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ভিতর দিয়ে যে অশনি সঙ্কেত আসছে



তা দেখেও না দেখার উপায় নেই আর।
পরিশেষে যা বলার তা হল, পূর্ববাংলার
নিজামুদ্দিন বা নুরুল আমিনের মতো ধৃতরাষ্ট্র
কিংবা জিম্মার ডাইরেক্ট অ্যাকশন'এর সার্থক
রূপকার, কলকাতার রাস্তায় লাশের পাহাড়

বানানো, সোহরাওয়ারদিই নয়; ইতিহাসের
আদালতে বিচার চাই, দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত
দলিত-নিরম-সর্বস্বান্ত 'বাঙালিগুলোর' ওপর
যাঁরা মরিচঝাঁপিতে গুলি চালানোর অর্ডার
দিয়েছিলেন সেই 'উদ্বাস্ত' জ্যোতি বসু, অশোক

মিত্রদেরও। যতদিন সেই বিচার না হচ্ছে ততদিন
'পশ্চিমবঙ্গ' নামটা আমাদের হৃদয়ের গহীনে
গেঁথে যাওয়া সঙ্গীন। তাকে উপড়ে ফেলতে
চাইলে, আগে আমাদের হৃৎপিণ্ডগুলোকে
উপড়ে ফেলতে হবে, মাই লর্ড।



মার্জার দৃষ্টি- ছবিটি অর্ঘ্য চট্টপাধ্যায়ের ক্যামেরায়



“শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ”: মহামায়ার সংসার

দীপাঞ্জনা শর্মা

পুজো এলেই আমার নিত্যানন্দ
মহারাজের কথা মনে
পড়ে। ব্যারাকপুর

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা এই
মানুষটি রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াকালীন বাবার কাছে
পরিচিত ছিলেন ‘কেষ্টদা’ হিসাবে, পূর্বাশ্রমের
নামে। ব্যারাকপুরে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন
বিরিঞ্চিদা।

একবার পুজোতে বিরিঞ্চিদা আশ্রমের বাচ্চাদের
জন্য কিনে এনেছেন জামা-কাপড়। অফিসে বসে
সেসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন মহারাজ। পাশে
বসে বাবা লক্ষ করছেন, মহারাজের মুখে ফুটে
উঠছে অপ্রসন্নতা। বিরিঞ্চিদার পরপর বলে যাওয়া
হিসাব শুনতে শুনতেই মহারাজ বলে উঠলেন,
“আরেক সেট করে জামা কিনে নিয়ে আয়।”
বিরিঞ্চিদা বললেন, “এগুলো তবে ফেরত দিয়ে
আসি?”

মহারাজ বললেন, “তা কেন, এগুলো থাকুক;
তুই বরং ভালো দেখে আরেক সেট নিয়ে আয়।”
বিরিঞ্চিদা প্রশ্নমাত্র না করে চলে গেলেন আঞ্জা
পালনে। বাবার মুখে জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি দেখে
মহারাজ নিজেই বললেন, “দীপক, আমি জানি
ওরা অনাথা। ওরা নিজেরাও জানে। তাই কখনোই

কোনো আবদার করে না। এই জামাগুলো ভালো,
কিন্তু ঠিক পুজোর জামার মতো নয়। আর মায়ের

*বিজ্ঞান যত মানুষের সভ্যতাকে
এগিয়ে নিয়ে গেছে আরাম এবং
বিলাসিতার দিকে, ধর্ম ততই মানুষকে
আকৃষ্ট করেছে ত্যাগের মাধ্যমে।
বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার মানুষের
দৈনন্দিন জীবনের পরিশ্রম লাঘব
করেছে, তাই বিজ্ঞান অনেক বেশি
বাস্তববাদী বলে সমাদৃত হয়েছে।
অন্যদিকে ধর্ম শিখিয়েছে কৃচ্ছ্রসাধন
ও আত্মনিয়ন্ত্রণ, ফলে সে খেতাব
পেয়েছে অলৌকিকত্বের। কিন্তু ভালো
করে বিচার করলে দেখা যায়, ধর্ম
ও বিজ্ঞানের তেমন কোনো মহাযুদ্ধ
নেই।*

আসার এই দিনে আমি ওদের মনে কোনো
খেদ রাখতে দিতে চাই না। ওরা যেন না ভাবে

যে, অনাথ বলে ওরা পছন্দমতো জামা-কাপড়
পরতে পেল না।”

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এই দর্শন বাবার চিন্তাকে
আমূল প্রভাবিত করেছিল।

প্রাচীন যুগ থেকে বিজ্ঞান ও ধর্মকে দুই বিপরীত
মেরুর বস্তু হিসেবে দেখা এবং দেখানো
হয়েছে। বিজ্ঞান যত মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে
নিয়ে গেছে আরাম এবং বিলাসিতার দিকে,
ধর্ম ততই মানুষকে আকৃষ্ট করেছে ত্যাগের
মাধ্যমে। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার মানুষের
দৈনন্দিন জীবনের পরিশ্রম লাঘব করেছে, তাই
বিজ্ঞান অনেক বেশি বাস্তববাদী বলে সমাদৃত
হয়েছে। অন্যদিকে ধর্ম শিখিয়েছে কৃচ্ছ্রসাধন
ও আত্মনিয়ন্ত্রণ, ফলে সে খেতাব পেয়েছে
অলৌকিকত্বের। কিন্তু ভালো করে বিচার করলে
দেখা যায়, ধর্ম ও বিজ্ঞানের তেমন কোনো
মহাযুদ্ধ নেই। কীভাবে? একটু দেখার চেষ্টা করি।
এটা আজ অনেকেরই জানা যে, বাংলা সাহিত্যের
প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যার পূর্ণ নাম ‘চর্য্যচর্যবিশিষ্টয়’।
অর্থাৎ যা ‘চর্য’ বা আচরণীয় এবং যা ‘অচর্য’ বা
অনাচরণীয়, সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে যে গ্রন্থে
বলা হয়েছে, তাই চর্য্য। রচনাকার চরিশ জন বৌদ্ধ
সিদ্ধাচার্য; অর্থাৎ যাঁরা আচরণগতভাবে সিদ্ধ বা

আচরণ প্রাপ্ত। তাঁরা আভিপ্রায়িক ভাষায় শিষ্যদের ‘জীবনের’ পাঠ দিচ্ছেন। চর্যায় যাকে মোক্ষ বলা হচ্ছে, তার নাম সহজ-মহাসুখ।

সেটা কী? তাহলো, জাগতিক সুখের মধ্যে যা সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শৃঙ্গারজনিত সুখ, তারই অনিঃশেষ মাত্রা।

মানবদেহের সুষুম্নার দু-দিকের নাড়ি থেকে ‘চিন্তা’কে টেনে এনে চালনা করতে হবে সুষুম্নাপথে। অভিকর্ষের বিপরীত সেই যাত্রা। দেহস্থ চারটি চক্রের মাধ্যমে অনুভূত হবে শূন্যতা। নাড়ি থেকে কণ্ঠ, বক্ষ হয়ে সহস্রার বা উষ্মীষে সেই শূন্যতা অনুভব করলে সাধক লাভ করেন সহজানন্দ। এবার প্রশ্ন, এই সূত্রের সঙ্গে

সৃষ্টি হয় ভ্রম বা ভ্রান্তির। চর্যাকার ভুসুকুপাদ যাকে বলছেন, ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’ তত্ত্ব। ৪১ সংখ্যক চর্যার অর্থ ও তার বিস্তার করতে গিয়ে জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী তাঁর ‘চর্যাগীতির ভূমিকা’ গ্রন্থে বলেছেন—

“শূন্যবাদীদের দৃষ্টিতে সবই শূন্যস্বভাব। জগতের উৎপত্তি একটা ভ্রান্ত প্রতীতি মাত্র। এই ভ্রান্ত প্রতীতি নানারকমের হয়, কখনও বস্তুগত বা ইলিউশন। আবার, কখনও অমূলক বা ব্যক্তিগত হ্যালুসিনেশন। রজ্জুতে সর্পভ্রম ব্যক্তিগত ভ্রান্তি, বক্ষ্যাপুত্রের বালুকাতেল, শশশঙ্গ, আকাশকুসুমে খেলাও অবস্তুগত ভ্রান্তি; এগুলির কোনটিরই অস্তিত্ব নাই। আবার মরুমরীচিকা, আকাশে

দুই-ই পরম সত্যের সন্ধান করে। তাই সাধু যেমন বিজ্ঞানী হতে পারেন, তেমনি বিজ্ঞানীও হতে পারেন সাধু। বাবা সেদিন বাড়ি ফিরে এসে বলেছিলেন, আমরা ছোট পরিসরে সামান্য কয়েকজনকে নিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে যাই, সেখানে কেউদার মতো সংসারত্যাগী মানুষ এত বড় দায়িত্ব কী নির্বিকার চিন্তে পালন করে চলেছেন!

পূজার সময় মায়ের সামনে মহারাজ যখন নতুন জামা পরিহিত হাস্যোজ্জ্বল আশ্রমিকদের নিয়ে অঞ্জলি দেন, তাঁর মন্তোচ্ছারণে দেবভূমির বাতাস আরও স্বর্গীয় হয়ে ওঠে। পাশে দাঁড়িয়ে বাবা নির্নিমেষে প্রত্যক্ষ করেন সেই দৃশ্য।



বিজ্ঞানের মিল কোথায়?

দৈনন্দিনতার প্রয়োজন পেরিয়ে বিজ্ঞানের বৃহত্তর পরিসর হল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন কথিত আপেক্ষিকতাবাদ। ‘থিওরি অফ রিলেটিভিটি’র জনক স্পষ্টই বলছেন— দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী পরিসরই সময় ও আকর্ষণ ক্ষমতার মাপক। পরিসর পরিবর্তনে পাল্টে যায় সময়ের ধারণা ও আকর্ষণ ক্ষমতা। এই পরিবর্তন থেকেই

প্রতিবিস্তৃত গন্ধর্বনগরী, দর্পণে প্রতিবিস্তৃত ছায়া এবং বাতাসের ঘূর্ণিতে কঠিন হওয়া বৃষ্টিশিলাকে সত্যিকারের পাথর মনে করা— এগুলি বস্তুগত ভ্রান্তি; এ ভ্রান্তিগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। তবুও এগুলি ভ্রান্তি।

জগতের উৎপত্তিও এই ধরনের প্রতীত্য-সমুৎপাদ মাত্র। এই সত্যকে যিনি বোঝেন, তিনিই পরমার্থসত্যকে বোঝেন।” শেষত, ধর্ম ও বিজ্ঞান

আজ কেউ মহারাজও নেই, আর বাবাও চলে গেছেন একবছর হতে চললো। মানুষ চলে গেলেও কথাগুলো তো থেকে যায়...জৈষ্ঠ্যের তাপে, শ্রাবণের জলে, সবুজ শ্যাওলা ঘেরা দিঘির অতলের মতো মায়াময় স্নিগ্ধতায় মায়ের আশীর্বাদ ও করুণা শতধারায় নেমে আসে সকলের মাথার উপর। ফুলে-ফলে পল্লবিত হয়ে ওঠে মহামায়ার সংসার।



হিমালয় আর যাত্রীর কথোপকথন

দেবব্রত কর বিশ্বাস

কেদারনাথের পথে একটি জায়গা পড়ে, তার নাম লিখেগালি। ২০১৯ সালে কেদারনাথ যাওয়ার পথে বড় লিখেগালিতে রাত্রিবাস করেছিলাম। ক্লান্তি আর ভয়ঙ্কর শীতে সারা শরীর কাঁপছিল। জীবনে প্রথম হিমালয়ে পদব্রজে যাত্রা বলে কথা! তাকিয়েছিলাম, উল্টোদিকের পাহাড়ে। সেই পাহাড়ের গায়ে ২০১৩ সালে ধ্বসে পড়া পথ। সেই ধ্বংসের দিকে তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতেই কথা শুরু হয় অন্তরের হিমালয়ের সঙ্গে।

১.

– স্যর, পাহাড়টার দিকে তাকাতে পারছি না।

– কোন পাহাড়?

– আমি মন্দাকিনী নদীর যে পাশে দাঁড়িয়ে, ঠিক অন্য পাড়ে ওই যে পাহাড়টা! কী ভয়ঙ্কর শীত! কী প্রচণ্ড হাওয়া! কেঁপে যাচ্ছি স্যর। কিন্তু তার চেয়েও কেঁপে যাচ্ছি ওই পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে...

– কিন্তু তুমি কাঁপছ কেন?

– পুরো ধ্বসে গেছে এখন। দেখতে পাচ্ছি

মাঝখান দিয়ে ধ্বসে গেছে। বুরবুরে হয়ে গেছে

পুরো।

– তাতে হয়েছেটা কী? এখানে ধস খুব স্বাভাবিক দেবব্রত।

– আপনি তো জানেন স্যর, আগে ওখানে রাস্তা ছিল। ওই রাস্তা দিয়েই লোকজন কেদারনাথের কাছে যেতেন। হেঁটে, ঘোড়ায় চেপে, ডুলিতে... সেই ২০১৩ সালের বন্যায় সব ধ্বসে গেছে। আমি যেন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ওই ধ্বসে

যাওয়া রাস্তা, ওই বুরবুরে মাটির নীচে কত মানুষের মৃতদেহ, কত স্বপ্নের লাশ, কত কত অসমাপ্ত ঘটনার হাহাকার করছে স্যর।

– সে তো বটেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, সেই হাহাকার তোমায় স্পর্শ করছে কেন? তুমি তো ওই রাস্তার কেউ নও। কোনওদিন যাওনি ওই পথে। তুমি তো এই প্রথমবার কেদারনাথে যাচ্ছ, নতুন তৈরি হওয়া রাস্তাটা দিয়ে। সেই রাস্তাটা কি তোমায় সঙ্গত করছে না? তোমায় পৌঁছে দিতে চাইছে না?

– না না স্যর। এই রাস্তাটা ভালো। কিন্তু ওই পুরনো রাস্তাটা! ওটাও তো ভালো ছিল। কিন্তু একদিন পাহাড় ধ্বসে সব ভেসে গেল...

তাকাতে পারছি না স্যর। তাকাতে পারছি না...

– তাকিয়ে না। যে রাস্তা তোমার, সেই দিকে তাকাও। যে রাস্তা তোমার নয়, যে রাস্তা ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই দিকে তাকিয়ে তুমি নিজের মনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে কেন? তোমায় কী শেখাচ্ছি দেবব্রত? ধ্বংসের দিকে তাকালে, ধ্বংসের কথা ভাবলে সেই ধ্বংসের দাগ মনে গাঢ় হয়ে বসে যায়। মনে রাখবে, সৃষ্টি হলে ধ্বংস অনিবার্য। তোমার দেহটাও একদিন শেষ হয়ে যাবে, ছাই হয়ে যাবে আগুনে। যদি তোমায় কেউ মনেও রাখে, সে কি তোমার দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়াকে মনে রাখবে?

– না স্যর। যদি কেউ সত্যি মনে রাখে, আমার জীবনের পথচলাটুকু মনে রাখবে।

– ঠিক। তাই ভেবো না ধ্বংসে যাওয়া পাহাড়ের নীচে কী আছে, কী নেই! সেসব তোমায় আবেগপ্রবণ সাহিত্যরচনায় সাহায্য করতে পারে বড়জোর। শান্তি দেবে না। তুমি তো স্বাধীনতা চাও...

– হ্যাঁ স্যর। যন্ত্রণা থেকে স্বাধীনতা। এমনকি আনন্দের উচ্ছ্বাস থেকেও স্বাধীনতা।

– তাই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করো। তার ছিঁড়ে ফ্যালো। দ্যাখো। দেখে যাও দেখায় কোনও

বন্ধন নেই।

২.

দেখতে দেখতে আমিও এগিয়ে চললাম। কিন্তু হিমালয় থেকে ফেরার পরে জীবনের পথে ভালো, মন্দ, ব্যর্থতা, সাফল্য, সুখ, দুঃখের ছায়া আমার পিছু নিল। ভাবনার আকাশে ভিড় করল ঘনঘোর মেঘ...

– মেঘ করে এসেছে স্যর। কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

– সংঘত হও আকাশের মেঘ তোমার মনে ঢুকে এলে চলবে?

– শুধু আকাশে

মেঘ? শুধু কি

মনের ভেতরে

মেঘ? যেদিকে

তাকাচ্ছি, সর্বত্র

মেঘ।

– এরকম হয়।

কী আর করতে

পারবে তুমি?

কতটুকুই বা

ক্ষমতা? সরিয়ে

দিতে পারবে

সব? নিজের

রাগ বিদ্বেষ

লোভ এসব

সরাতে পেরেছ

তুমি?

– পারিনি। চেষ্টা

করেছি কি?

করিনি। করিনি।

বরং রেগে গেছি, হিংসে করেছি, আফশোস করেছি, হাছতাশ করেছি... কতকিছু যে করেছি! অথচ আসল কাজটাই করিনি। নিজের চিমনির গা থেকে ভুষোকালি সরাতে পারিনি। আলো বেরোচ্ছে না তাই।

– যা যা সরাতে পারোনি সেসবই আজ মেঘ হয়ে গেছে। নিজের ব্যর্থতাই নিজেকে ভোগাচ্ছে তোমায়।

– তাহলে উপায়?

– নিজের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার পথ খুঁজে নিতে হবে। ভালো আর মন্দ, এই দুই নিয়েই তো তুমি। কেউ বলবে, মন্দকে ত্যাগ করে ভালোকে গ্রহণ করো। অন্য কেউ বলবে, মন্দের ভেতর দিয়ে হেঁটে ভালোর দিকে এগোও। আসলে তা নয়। আসলে ভালো আর মন্দ দুইকেই অস্বীকার করাটাই কাজ।

– যেমন?

– যেমন এই পথা একদিকে খাদ। অন্যদিকে খাড়া পাহাড়। তুমি কি খাদের দিকে চলে যাবে? নাকি খাড়া পাহাড় দিয়ে যাবে? এসব কিছুই করবে না তুমি। খাড়া পাহাড় আর খাদের মাঝখানে যে পায়ে হাঁটার সরু পথ অথবা পাকদণ্ডী, সেখান দিয়ে হাঁটবে তুমি। মধ্যখানে একটা পথ থাকে। সর্বদা।

– সে না হয় বুঝলাম, এই হেঁটে যাওয়ার নাম জীবন। কিন্তু ওই মেঘ? বড় আচ্ছন্ন করছে!

– ভেতরে আছি অথচ নেই, এমন?

– ঠিক তাই। জীবনে আছো, অথচ তোমার হাতে কিছুটি নেই। যে কোনও মুহূর্তে জীবন তোমায় ছেড়ে চলে যাবে। অতএব, দৃশ্যের ভেতরে থেকে দর্শক হয়ে ওঠো।

৩.

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি হিমালয়ের দিকে। বুকের ভিতরটা খালি খালি লাগে। আমার মনের কথা কাউকে বলে বোঝাতেই পারি না। কী চাই আমি?

– বৃহৎ-এর

সামনে দাঁড়ালে কী চাইতে ইচ্ছে করে তোমার?

– সামনে দাঁড়ানোর আগে ইচ্ছে করে অনেক কিছুই। কিন্তু আসল সময়ে চাইতে পারি না। তালগোল

পাকিয়ে যায়। – তা বেশ। কিছু বলতেও ইচ্ছে করে না?

– করে। খুব করে। কিন্তু কাছে গেলেই কথাটা হারিয়ে যায়।

– সেকি! কথা হারিয়ে যায়? তুমি তো সাহিত্যিক।

– সেকি! কথা হারিয়ে যায়? তুমি তো সাহিত্যিক।

– এমনটা হবেই। মেঘ দেখে মুহাম্মান হবে। আলো দেখে উচ্ছ্বসিত হবে। আসলে এটাকেই অতিক্রম করতে হবে। মুহাম্মান এবং উচ্ছ্বসিত, কোনওটাই হলে চলবে না। ভেবে নাও, ওগুলো দৃশ্য। সিনেমার মতো। দুর্গমিত হও, মুহাম্মান হয়ো না। আনন্দিত হও, উচ্ছ্বসিত হয়ো না। পারবে?

– পারলেই বা কী, না পারলেই বা কী? সবকিছু দৃশ্য ভেবে দর্শক হয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারা কঠিন।

– আলাদা নয়। দর্শক কি দৃশ্যের থেকে ভিন্ন?

নয়। দৃশ্যের অভিন্ন অংশ দর্শক। তবু কোথায়

গিয়ে সে আলাদা?

– কোথায়?

– সে দৃশ্যের ভিতরে অবস্থান করেও সম্পূর্ণটিকে ‘ভিন্ন’ হিসেবে দেখতে জানে।

সাহিত্যিকদের কথা কখনও হারিয়ে যায়?

– এই প্রশ্নের উত্তর তখনই দেবো, যদি তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।

– কী প্রশ্ন?

– কখন আর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে না তোমার?

– যখন না চাইতেই সব উত্তর স্পষ্ট হয়ে যায়।

– এই তো। ঠিক পথে যাচ্ছ। ধরো একটা ব্ল্যাক বোর্ড। সেখানে প্রশ্ন লিখতে গিয়েও লিখলে না, কারণ উত্তরটা তোমার জানা হয়ে গেছে অথবা প্রশ্নটাই অনর্থক মনে হচ্ছে। এবার তুমি ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে তাকালে কী দেখবে?

– কালো।

– মানে, অন্ধকার। তাই তো? এর মানে কী?

– কী?

– শূন্য। এমনটাই হয়ে যায় মন, বৃহৎ-এর কাছে দাঁড়ালে। শূন্য লাগে। অথবা পূর্ণ লাগে। কিন্তু



এসব ভাবতেও ইচ্ছে করে না বৃহৎ-এর কাছে দাঁড়ালো। শুধু দেখতে ইচ্ছে করে আর দেখতে ইচ্ছে করে..

৪.

হিমালয় যেভাবে বুঝিয়ে বলে, আর কেউ বলে না। হিমালয় যেভাবে বোঝে, আর কেউ বোঝে না। তাই এত ভুল-বোঝাবুঝি। তাই এত ক্ষতবিক্ষত, অপমানিত আর যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া মন। বারংবার মনে হওয়া, এই শহর-কেন্দ্রিক সভ্যতা আমার কেউ না। ফিরে যাই আবার, অন্তরের হিমালয়ের কাছে। ঠিক যেন, নিজেরই বাড়িতে ফেরা।

– মুখে আলো নেই কেন তোমার? মনখারাপ?

– হ্যাঁ। মানে ওই আর কী! যা হয় জীবনো।

অকারণে অপমানিত হওয়া, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া, ক্ষতবিক্ষত হওয়া... অকারণেই। ভালো লাগে না এসব আমার। যন্ত্রণা হয়। আলো নিভে যায়।

– ব্যাস? এটুকুই? এইটুকুতেই আলো নিভে গেল? এত কমজোর তোমার আলো? সামান্য ঝোড়ো হাওয়াতেই নিভে যায়?

– না, ঠিক নিভে যাওয়া নয় হয়তো। দপদপ করছে বলা ভালো। এই দপদপ করতে থাকা অবস্থাতেই আপনি দেখে ফেললেন।

– দপদপ করবে কেন?

– হয়তো ভালো বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই, অথবা আমিই হয়তো শক্ত করে বেঁধে উঠতে পারিনি আলোকে।

– এই যে। এখানেই সমস্যা। এই ‘আমি’!

এখানেই গলদ। ‘আমার মনে আলো নেই’,

‘আমি আহত হয়েছে’, ‘আমি শক্ত করে বাঁধিনি আলোকে’। এই ‘আমি’টা কে? এই আমিই কি তুমি? এই আমি’র কত বড় ক্ষমতা হে তুমি আলো বাঁধবে?

– জানি না স্যর। আমি কেন যে এই অকারণ আঘাতে আহত হয়ে যাই।

– তুমি আহত হও, কারণ তুমি ‘আমি’ ছেড়ে এখনও পুরোপুরি বেরোতে পারোনি। এই আমি’টাই সব সমস্যার মূলে। একটা কথা জানবে মন হি স্রষ্টা, মন হি ভোক্তা! এই ‘আমি’ থেকে উদ্ধৃত মনই আহত হয়েছে বলে মনে করছে আর এই মনই সেই আঘাত থেকে যন্ত্রণা পাচ্ছে।

– তাহলে ওই আলো?

– কোন আলো? যেটা তোমার মুখে আর মনে ছেয়ে থাকে সারাক্ষণ?

– হ্যাঁ। সেই আলোটা তবে কি?

– সেই আলো সূর্য ওঠার আভাস। সূর্যোদয়ের আগে এরকম আলো হয়। সেই আলোকে সূর্যোদয় বলে ভাবতে নেই। ভেবে ফেললেই জার্নি শেষ। ওই আলোই থাকে তোমার মুখে। তাকেই তুমি প্রকৃত আলো ভাবতে শুরু করেছিলে। হঠাৎ আঘাতের খেলা এসে তোমায় বুঝিয়ে দিল এই আলো সেই আলো নয়।

সেই আলো আসা মানে নিজের ছন্দ আমিকে অতিক্রম করে যাওয়া। সেই আলো এলে বোঝা যায় পৃথিবীর যে কেউ কটুকথা শুনিয়েও তোমায় আহত করতে পারবে না। কেন জানো?

সে আঘাত করছে তোমার বাইরের আমিকে।

তোমার ভেতরের আমিকে যদি তুমি জাগ্রত

করে স্থির থাকতে পারো, তাহলে বাইরের কেউই তোমায় আঘাত দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে পারবে না। কারণ সে চেনেই না তোমার ভেতরের আমিকে। যে চিনবে, সে আঘাত দেবে না। সে চিনে গেলে সে বুঝবে তার ভেতরের আমি আর তোমার ভেতরের আমার মধ্যে কোনও তফাত নেই। সেই আমি কোনও বিদ্যুতচালিত আমি নয়। সে আমি সূর্যের মতো। সূর্যকে কেউ আঘাত দিতে পারে? অপমানের মেঘ দিয়ে ঢেকে তার আলো আটকে দেওয়া যেতে পারে। সূর্যের কি কিছু যায় আসে তাতে? আসে না। মেঘের আড়ালেও সে একইরকম জ্বলজ্বল করে। মেঘ তর্জন গর্জন করে নিজেই ঝরে পড়ে যায়। সূর্যের কিছু যায় আসে না। তেমন আলো তোমার সন্তায় ফুটে ওঠার অপেক্ষা করে আছি।

– কখনও কি তা সম্ভব হবে?

– কেন হবে না? পাহাড়ি নদীকে দেখে শেখো। খানিকটা সমতল পেলে সে শান্ত হয়ে যায়, কিছু চরাও ফেলে দেয়। আবার পাথুরে জমিতে এলে খরস্রোতা হয়ে যায়। আবার কখনও যদি অনেক নীচু খাদের কাছে চলে যায়, সে তখন জলপ্রপাত হয়ে যায়। কিছু যায় না আসে না নদীর। সে জানে বয়ে চলাই তার কাজ। জীবনও তেমন। বয়ে চলাটাই কাজ। বিপদের পাথুরে জমি আসুক আর অপমানের খাদ আসুক, তুমি শুধু বয়ে যাবে সামনের দিকে...

আমি হাঁটতে থাকি। এই তীর্থ থেকে সেই তীর্থে। বাইরের আমি থেকে ভিতরের আমি’র কাছে। অন্তরের হিমালয়ে আশ্রয় নিই, সন্তানের মতো।



দ্য ডেড লেক- ছবিটি ঋষি ঘোষের ক্যামেরায়



ফরাসি উপনিবেশে “অনুশীলন” যোগসূত্র: চন্দননগরের শেঠবাড়ির দুর্গাপূজো

অন্তরা মুখার্জি

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজোর নানাবিধ আকর্ষণের অন্যতম হল দল বেঁধে ঠাকুর দেখতে যাওয়া। এই সময়ে শহর থেকে শহরতলি এমনকি কিছু গ্রাম-গঞ্জের নামজাদা বাড়ির পূজো দেখতে মানুষের ঢল নামে। উল্লেখযোগ্যভাবে সারা বাংলা দুর্গোৎসবের আনন্দে যখন মাতোয়ারা তখন কলকাতা থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চন্দননগরে দুর্গাপূজো দেখতে আসার খুব একটা ‘প্ল্যান’ প্রায় কেউই করে না। যেহেতু জগদ্ধাত্রী আরাধনার উন্মাদনায় চন্দননগর বিশ্বখ্যাত, এখানের দুর্গাপূজা নিয়ে মানুষের কৌতূহল এবং প্রত্যাশা প্রায় নেই বললেই চলে; সম্ভবত এই কারণে দুর্গোৎসবের প্রধান ধারায় ব্রাত্য থেকে যায় চন্দননগরে বনেদি বাড়িগুলিতে পূজিত দেবী দুর্গার আরাধনা-আখ্যান। আদিতে চন্দননগরে দুর্গাপূজো ছিল ঘরোয়া পূজো। জগদ্ধাত্রী পূজো প্রায় শুরু থেকে ব্যবসায়ীদের, ক্রমে বারোয়ারী পূজো হয়ে যায়। এর জাঁকজমক তাই আলাদা। অন্যদিকে বাহ্যিক আড়ম্বরে গা না ভাসিয়ে যুগ যুগ ধরে বাঙালি সনাতনী ধর্মের প্রতীক হিসেবে এই শহরে ঐতিহ্যশালী বনেদি বাড়ির পূজোগুলি দেবী দুর্গার আরাধনার ইতিহাস বহন করে চলেছে আপন বংশ মর্যাদার কৌলিন্যে। বর্তমানে বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজো হয় খলিসানির বোসবাড়ি (৫১৯

বছরের পূজো), গোন্দলপাড়ার মন্ডলবাড়ি (২০১ বছরের পূজো), ফোটোকগোড়ার ঘোষবাড়ি (২৩০ বছরের পূজো), লালবাগানের রক্ষিতবাড়ি (১৮৫ বছরের পূজো), দেপাড়ার দেবাড়ি (১৪৯ বছরের পূজো) এবং পাঁচশো বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা, বৈবাহিক সূত্রে পূজো পাওয়া, পালপাড়ার শেঠবাড়িতে। শেঠবাড়ির পূজোর মাহাত্ম্য শুধু দেবীর আরাধনা করায় নয়; ঐতিহ্যশালী বংশ পরম্পরায় যে সনাতনী ধর্মের আচার অনুষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায় আজও তার সঙ্গে মিলে মিশে আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত (নভেম্বর, ২০১৭) এই বাড়ির পূজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিপ্লবীদের এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

চন্দননগরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, তিনতলা প্রাসাদতুল্য শেঠবাড়ির নির্মাণের কাজ শুরু হয় সম্ভবত ১৮৮৫ সালে। বাগান, পুকুর, দালান এবং ঠাকুরবাড়ি দিয়ে মোরা এই বাড়ি তৈরী হয় ইন্দো-ইউরোপিয়ান গঠন শৈলীর নিরিখে। পরবর্তীকালে এই বাড়ির কিছু গঠনমূলক পরিবর্তন করেন এই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করা দেশাত্মী হরিহর শেঠ (১৮৭৮ — ১৯৭২)। ফ্রান্স এর সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান “সেভ্যালিয়ে দে ল্যা লিজিওন অনার”

প্রাপক শ্রী হরিহর শেঠ ছিলেন শ্রী নৃত্যগোপাল শেঠ এবং শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান, আধুনিক চন্দননগরের রূপকার, বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক; মূলত তাঁর সময় থেকেই এই বাড়ির দুর্গাপূজো এক অন্য আঙ্গিকে অনুষ্ঠিত হতে থেকে। এই বাড়ির ঠাকুরদালানে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন বিশাল স্তম্ভের সারি। শেঠবাড়ির প্রতিমাটি অত্যন্ত সনাতনী এবং ডাকের সাজে সজ্জিত; বৈষ্ণব মতে পূজো হওয়ার কারণে এই বাড়ির পূজোতে বলি-প্রথার চল নেই। রথযাত্রার দিনে কাঠামো পূজোর পর দুর্গাদালানে বসে মূর্তি তৈরির কাজ হতো। সময়ের সঙ্গে দুর্গাপূজোর রীতিতেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন কাঠামোটি পাঠানো হতে লাগলো কুমোরের বাড়ি। মূর্তি তৈরী হয়ে আবার দালানে ফিরিয়ে আনা হত। শুরুর দিকে দেবীর বোধন হতো প্রতিপদে, নিয়ম পরিবর্তন করে বোধন হতে শুরু হল মহালয়ায়। তবে বাড়ির পুকুরের ঘাটে কলা বো স্নান আর অষ্টমীতে কুমারী পূজোর রীতিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি আজ ও।

শহরের অন্যান্য বনেদি বাড়ির পূজোর থেকে ভিন্ন এই শেঠবাড়িতে দুর্গোৎসবের আচারের অগোচরে চলেছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পবিত্র কর্মকাণ্ড যা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস চর্চায় প্রায় ব্রাত্য থেকে গেছে। এই

বাড়িতে অষ্টমীর দিন ঠাকুরদালানে বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্বদেশী চেতনার চর্চা হতো; পূজোর দিনে এই প্রকার অনুষ্ঠানের রীতির মূল উদ্যোগী ছিলেন বাড়ির ছোট ছেলে, শ্রী দুর্গাদাস শেঠ (১৮৯৫ – ১৯৫৮)। যে সময়ে তিনি চন্দননগরে বিপ্লবী চেতনার পূজারী হলেন সেই সময় শহরে ফরাসি সুবাস। এবং এই ফরাসি রাজত্বে থাকা অথচ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ এর সুযোগ তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উঠিয়েছিলেন।

ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে বোঝা যাবে যে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চন্দননগরে ভিন্নভাবে অনুভব করা গেছিল। উনিশ শতকের শেষ কুড়ি বছর চন্দননগরে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণপুরুষদের জন্ম; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মতিলাল রায়, চারুচন্দ্র রায়, কানাইলাল দত্ত, মণীন্দ্রনাথ নায়েক, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। এছাড়া ফরাসি শাসিত চন্দননগর ব্রিটিশ পুলিশের নাগালের বাইরে থাকায় বিপ্লবীদের প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ পুলিশ অনুমতি ছাড়া শহরে তল্লাশি করতে পারতো না, সময়টা কাজে লাগাতেন বিপ্লবীরা। শুধুমাত্র দেশাত্মবোধক, ব্রিটিশবিরোধী প্রচার করার পত্র পত্রিকা (মাতৃভূমি, সেবক, স্বদেশী বাজার, দেশহিতৈষী, প্রবর্তক, নবসংঘ, প্রজাবন্ধু, দেশহিতসভা ইত্যাদি) প্রকাশের এক অনুকূল জায়গায় নয়, এই শহরে যুবকরা অনুশীলন সমিতির সাথে ও যোগাযোগ তৈরি করেন। সেই সূত্র ধরে বারীন ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কররা চন্দননগরে আসেন; দুর্গাপূজোর ভিড়ে বিপ্লবীরা মিশে বিপ্লবের প্রচারে চন্দননগরে এসেছে। বারীন ঘোষ ১৯০৭ সালে দুর্গাদশমীর দিন দেখা করেছেন চারুচন্দ্র রায়ের সঙ্গে; তবে শুধু দুর্গাপূজোর সময় না, অন্যান্য সময়েও অনেক বিপ্লবী এসেছেন – ১৯১০ সালে এবং তার আগেও শহরে আসেন অরবিন্দ ঘোষ, ১৯২৩ সালে বিপিনচন্দ্র পাল, সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী ইত্যাদি। রাসবিহারী বসুর কৈশোর তো এখানেই কেটেছে। মতিলাল রায়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ‘সংগঠনবল্লী সম্প্রদায়’, যারা সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে মুক্তিসংগ্রামের চেতনায় লিপ্ত হয় এবং ৭ই আগস্ট, ১৯০৫, স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সমর্থনে এক ঐতিহাসিক মিছিল করে। এছাড়া এই শহর হয়ে উঠে বোমা তৈরির কেন্দ্রস্থল। ১৯১২ সালে রাসবিহারী বসু ও বসন্তকুমার বিশ্বাসের

নেতৃত্বে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর যে বোমা ফেলা হয় সে বোমা মণীন্দ্রনাথ রায় চন্দননগরে তৈরী করেন।

দুর্গাদাস শেঠ ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব, অনুশীলন সমিতির একনিষ্ঠ সদস্য এবং অগ্নিযুগের বাঙালি বিপ্লবী। স্বদেশ প্রেমের পাঠ পেয়েছিলেন মাস্টারমশাই জোতিষ চন্দ্র ঘোষের নিকট। তিনি চন্দননগরের যুবকদের সংগঠিত করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯২৭ সালে নবীন প্রজন্মকে দেশীয় ভাবধারায় চালনা করার আঙ্গিকে চন্দননগরে ‘শিল্প সমবায়’ (লক্ষীগঞ্জ এলাকায় একটি ছোট দোকান) প্রতিষ্ঠা



করেছিলেন যা ছিল খন্দর ও স্বদেশী পণ্যের কেন্দ্র; ‘স্বদেশী বাজার’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও চালু করেছিলেন যেখানে তিনি আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও বিপ্লবী নিবন্ধগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন কাহিনী প্রকাশ করেছিলেন। বিপ্লবীদের গোপনে আশ্রয় ও বিপুল অর্থ সাহায্য করতেন তিনি। রাসবিহারী বসু, কানাইলাল দত্ত, শ্রীশ চন্দ্র ঘোষের মতো বিপ্লবীরা প্রায়ই শেঠবাড়ির ঠাকুরদালানের গোপন কক্ষগুলিতে আশ্রয় নিতেন।

শেঠবাড়িতে, বিশেষভাবে, দুর্গোৎসবের সময় বিপ্লবীদের আসা-যাওয়ার চল সবার অগোচরে থাকলেও এই তথ্য গোপন থাকেনি বাড়ির মহিলাদের কাছে। সেই যুগে শেঠবাড়ির মহিলারা দুই প্রগতিশীল ভাবধারায় বিশ্বাসী প্রাণপুরুষদের কারণে নির্দিষ্ট, নিশ্চিত পূজোর কাজে লিপ্ত থাকতে পেরেছেন। শ্রী হরিহর শেঠ এবং শ্রী দুর্গাদাস শেঠ বাড়ির পূজোয় এক ব্যতিক্রমী নিয়ম চালু করেন; নারীদের তৎকালীন সমাজে পর্দা প্রথা থাকলেও শেঠবাড়িতে এই প্রথা

কার্যকরী থাকলো না। পূজোর সমস্ত যোগাড়, উপাচার তৈরি এবং নৈবেদ্য সাজানোর মূল দায়িত্বে থাকতেন বাড়ির মহিলারা। পূজোর সময় বাড়ির মহিলারা একটি বিশেষ নিয়ম মেনে চলতেন। তারা দুর্গাদালানের অন্তরালে ভোগের থালায় পাশাপাশি বিপ্লবীদের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাবার লুকিয়ে রেখে আসতেন। পূজো ও উৎসবের হট্টগোলের সুযোগে বিপ্লবীরা সেখানে এসে ক্ষিদে মেটাতে এবং পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করতেন। ঠাকুরদালানে ভোগের নামে বাড়িরই মহিলারা পৌঁছত বিপ্লবীদের জন্য খাবার; স্বাধীনতা আন্দোলনে, পরোক্ষ ভাবে, এই বাড়ির মহিলারাও রীতি নীতির অছিলায় তাদের নিঃশূচপ

অবদান রেখে গেছেন। বলা যেতে পারে যে বাড়ির ছেলেটির যথাযথ সঙ্গ দিয়ে তাঁরা দেবী দুর্গার সেবার আড়ালে ভারত মাতার দামাল ছেলেদের দু-দণ্ড শাস্তি দিয়েছিলেন। তাঁদের বিপ্লবের ‘সেবা দাসী’ হিসেবে চিহ্নিত না করে আমাদের উচিত চন্দননগরে স্বাধীনতার যে আগুন জ্বলেছিল সেই আগুনে ঘি ঢালার প্রয়োজনীয় কাজে যারা লিপ্ত ছিলেন তাঁদের স্বসম্মানে স্মরণ করে পুনর্মূল্যায়ন করা।

এখন সময় এসেছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক কোণঠাসা হয়ে থাকা বাঙালির

অবদানকে সামনের সারিতে এনে গৌরবের সঙ্গে জাতীয় ভাবে বরণ করা। অবিবাহিত থেকে পারিবারিক সম্পত্তির থেকে প্রাপ্ত অর্থ তিনি দান করে দেন পন্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রমে; তাঁর সহযোগিতা না থাকলে পন্ডিচেরির অরবিন্দ আশ্রমের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হত; তাঁর আর্থিক সাহায্যে রাসবিহারী বসুর জাপানযাত্রা সম্ভব হয়েছিল; কিন্তু এই স্বার্থত্যাগী বিপ্লবীর শেষ জীবন কাটে দুঃখে, দারিদ্রে এবং তিনি হারিয়ে যান এক অজ্ঞতার অন্ধকারে। শেঠবাড়ির বর্তমান প্রজন্ম শ্রী গৌতম শেঠ মহাশয়ের সঙ্গে একান্ত কথোপকথনে জানা যায় যে অর্থ সাহায্য করতে না পারায় পন্ডিচেরির আশ্রম থেকে তিনি একপ্রকার বিতাড়িত হন; গৃহত্যাগের অনেকদিন পর তাঁর খোঁজ মেলে বেনারসে; বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেও তিনি আবার গৃহত্যাগী হন এবং তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত নথি সেভাবে পরিবারের কাছেও নেই। ঐতিহ্যশালী দুর্গাপূজোর বর্তমানে দায় ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে চলা গৌতম বাবুর আশা যে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর পরিবাবের অবদান



এবং চন্দননগরের এই কৃতি সন্তান একদিন সঠিক মর্যাদায় সমাদৃত হবে। যে মানুষটি দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন, সময় ও সম্পদ

উজাড় করে দিয়েছিলেন, সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সনাতনী ধর্মের বাহক শ্রী দুর্গাদাস শেঠ মহাশয় কেন আজও এতটা বিস্মৃত আমরা কি তার

সুলুকসন্ধানে ব্রতী হবো না ? নাকি রাজনীতির ঘেরাটোপেই দুর্গাদাসের মতো চরিত্র হারিয়ে যাবেন কালের অতলে? প্রশ্ন রয়েছে যায়!

রাজ্য-কেন্দ্র দড়ি টানাটানি... ডবকা উত্তর থেকে হাজামজা দক্ষিণ... উড়ে আসে কালো নোটের বাড়িল... মিথ্যে পরিসংখ্যান... অল ক্রিয়ারের বিপ বিপ... নতুন সংস্করণ

মালদার গঙ্গা ভাঙন নিয়ে অনবদ্য রিপোর্টার্স সংকলন

চেতনা প্রকাশনী

কলকাতা-১২৪

যোগাযোগ: 7980413767

“...ওগো নদী, শোনো, ওগো খণ্ডিতা স্মৃতি,
ভুলো না অতীত, এনোনা জলের পীড়া
একটি কবিতা শিরোনাম, বিস্মৃতি—
লিখেছি বলেই বিমুখ কি সাক্ষীরা?
ভালোবাসা বলো কি চাও প্রেমের দাম?
রতিতে মেটেনি? রক্তে মেটাও সাথ,
প্রথম পাড়ায় যেখানে তোমার নাম
কেটে সেখানেই লিখে দাও প্রতিবাদ।”
— আল মামুদ



খায়ি ঘোষ

লিটল ম্যাগাজিনে গদ্য ও সংবাদপত্রে ফিচার লিখেছেন গত দুই দশক ধরে। প্রকাশিত ও সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা সবমিলিয়ে ছটি গবেষণা করেছেন নয়ের দশকের বাংলা সাহিত্যের বিপণনসত্ত্বনা নিয়ে। যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি। কাজ করেছেন আধুনিক বাংলা কবিতা, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ, আধুনিক কথাসাহিত্য, দলিত সাহিত্য সহ সাংস্কৃতিক বিদ্যাচর্চার নানা বিষয়ে। চলচ্চিত্রবিদ্যা ও আন্তঃ সাংস্কৃতিক বিদ্যাচর্চার একজন উৎসাহী গবেষক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণাপত্রের সংখ্যা পঞ্চাশের উপরে। গঙ্গাভাঙন নিয়ে একটি ইন্দো-বাংলা গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একটি জাতীয় পুরস্কারজয়ী চলচ্চিত্রের ভাষাগত রূপান্তরের কাজ করেছেন। কর্মসূত্রে মালদার গৌড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক।



বিনিময়: ১০০ টাকা

বিচ্ছিন্ন লগাইলে ফুলবাড়ি

মালদার গঙ্গা ভাঙন : একটি সাম্প্রতিক আখ্যান

বিচ্ছিন্ন লগাইলে ফুলবাড়ি

মালদার গঙ্গা ভাঙন : একটি সাম্প্রতিক আখ্যান

খায়ি ঘোষ

খায়ি ঘোষ

নারীশিক্ষায় ভারতের বদলে যাওয়ার মানচিত্র

সঙ্ঘমিত্রা গোস্বামী

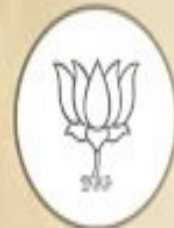
একটি মেয়ের হাতে যখন বই ওঠে, তখন শুধু একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ বদলায় না—বদলে যেতে শুরু করে একটি সমাজের মানসিকতা। যে পরিবার একসময় মেয়ের শিক্ষাকে ‘বিয়ের আগে পর্যন্ত প্রয়োজনীয়’ বলে মনে করত, সেই পরিবারেই আজ মেয়ের উচ্চশিক্ষা, চাকরি, স্বনির্ভরতা এবং নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই পরিবর্তন একদিনে আসেনি। গ্রাম, মফস্বল ও প্রান্তিক অঞ্চলের অসংখ্য মেয়ের দীর্ঘ সংগ্রাম, পরিবারের ধীরে ধীরে বদলে যাওয়া মানসিকতা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকা এই পরিবর্তনের ভিত তৈরি করেছে।

মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলার বহু গ্রামীণ অঞ্চলে আজও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পথে একাধিক বাস্তব বাধা রয়েছে। আর্থিক অনটন, যাতায়াতের সমস্যা, অল্প বয়সে বিয়ে, গৃহস্থালির দায়িত্ব, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ, ডিজিটাল সুযোগের অভাব এবং কোথাও কোথাও সামাজিক রক্ষণশীলতা—সব মিলিয়ে মাধ্যমিকের পর অনেক মেয়ের শিক্ষাজীবন থেমে যায়। বিশেষত দরিদ্র ও প্রথম-প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি অনেক সময় একই রকম। তবে বাস্তব চিত্রের অন্য একটি দিকও রয়েছে। যে মেয়েটি কয়েক বছর আগে মাধ্যমিকের পর পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার মুখে ছিল, সে আজ কলেজে গিয়ে স্নাতক হচ্ছে; কেউ শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, কেউ নার্সিং বা স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত হচ্ছে, কেউ সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আবার কেউ প্রযুক্তি ও ডিজিটাল শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে নিজের কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করেছে। এই ছোট ছোট সাফল্যই বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

ধরা যাক, সীমান্তবর্তী একটি গ্রামের দরিদ্র পরিবারের এক কন্যা উচ্চমাধ্যমিকের পর কলেজে ভর্তি হল। পরিবারের আয় সীমিত। প্রতিদিন দূরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করাও সহজ নয়। কিন্তু বৃত্তি, সরকারি সহায়তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরামর্শ এবং পরিবারের সহযোগিতায় সে পড়াশোনা চালিয়ে গেল। কয়েক বছর পর সেই মেয়েটিই যখন শিক্ষকতা বা অন্য কোনও পেশায় প্রবেশ করে, তখন তার নিজের জীবনই শুধু বদলায়



- Expansion in all districts of the country
- Led to improvement in Child Sex Ratio in 104 districts





VERINGNARISHAKTI

eti Bachao
eti Padhao



না। তার ছোট বোনের সামনে একটি নতুন পথ খুলে যায়। প্রতিবেশী পরিবারগুলিও বুঝতে শুরু করে—মেয়েকে পড়ানো ব্যয় নয়, ভবিষ্যতের বিনিয়োগ। আরও একটি দৃশ্য আজ ক্রমশ পরিচিত হয়ে উঠছে। কোনও সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়ে উচ্চশিক্ষায় গিয়ে প্রথমবারের মতো নিজের পরিবারের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের ডিগ্রি অর্জন করছে। তার সাফল্যকে শুধু ব্যক্তিগত অর্জন হিসেবে দেখলে ছবির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অদৃশ্য থেকে যায়। তার শিক্ষার মাধ্যমে পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন বদলায়, ছোট ভাই-বোনেরা অনুপ্রাণিত হয় এবং মেয়েদের সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ধারণা প্রশ্নের মুখে পড়ে। শিক্ষার এই প্রভাব কোনও একটি ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সমাজের সামগ্রিক মানবসম্পদকে শক্তিশালী করে।

নারীশিক্ষার প্রকৃত সাফল্য শুধু বিদ্যালয় বা কলেজে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল—তারা কতদিন শিক্ষায় থাকছে, উচ্চশিক্ষায় কতদূর এগোচ্ছে, দক্ষতা অর্জন করছে কি না, কর্মজগতে প্রবেশ করছে কি না এবং নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটা সক্ষম হচ্ছে।

এই পরিবর্তনে শিক্ষকদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষক যখন কোনও পিছিয়ে-পড়া ছাত্রীকে বলেন, “তুমি পারবে”, তখন সেটি শুধুমাত্র উৎসাহের বাক্য নয়। অনেক সময় সেটিই হয়ে ওঠে শিক্ষাজীবন চালিয়ে যাওয়ার মানসিক শক্তি। দরিদ্র পরিবারের ছাত্রীকে বৃত্তির খবর দেওয়া, উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে জানানো, অনলাইন আবেদন করতে সাহায্য করা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া কিংবা পড়াশোনায় দুর্বল শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত সহযোগিতা করা—এসব ছোট উদ্যোগের সামাজিক মূল্য অনেক বড়।

এই পরিবর্তনের বাস্তব ছবি একজন কলেজ শিক্ষিকার চোখে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাউথ মালদা কলেজে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে আসা ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার পরিসরে ক্রমশ নিজেদের জায়গা তৈরি করছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু পরিবারের বহু ছাত্রীর ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনায় লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। কয়েক বছর আগেও যে ছাত্রী হয়তো উচ্চশিক্ষাকে পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে থাকা একটি স্বপ্ন বলে মনে করত, আজ সে কলেজের শ্রেণিকক্ষে বসে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করছে। কেউ শিক্ষক হতে চায়, কেউ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যেতে চায়, কেউ স্বাস্থ্য পরিষেবা বা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এই স্বপ্নের বিস্তারই আসলে নারীশিক্ষার সামাজিক সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

একজন শিক্ষিকা হিসেবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে পরিবর্তনটি চোখে পড়ে, তা হল ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। উচ্চশিক্ষা তাদের শুধু একটি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ দিচ্ছে না; নিজের মত প্রকাশ, প্রশ্ন করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতনভাবে ভাবার ক্ষমতাও তৈরি করছে। সংখ্যালঘু পরিবারের অনেক ছাত্রী আজ বুঝতে শিখছে যে তাদের পরিচয় তাদের সম্ভাবনার সীমা নির্ধারণ করে না। পরিবার, সমাজ বা আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শিক্ষা তাদের সামনে বিকল্প পথ তৈরি করতে পারে। শ্রেণিকক্ষে তাদের প্রশ্ন করার আগ্রহ, আলোচনায় অংশগ্রহণ, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক-শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা এবং ভবিষ্যৎ পেশা সম্পর্কে সচেতনতা—সব মিলিয়ে একটি নতুন আত্মবিশ্বাসী প্রজন্মের ছবি সামনে আসে।

তবে এই পরিবর্তনের পথ সবসময় সহজ নয়। অনেক ছাত্রীকে পারিবারিক দায়িত্ব, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, যাতায়াতের অসুবিধা কিংবা সামাজিক প্রত্যাশার সঙ্গে সমন্বয় করে এগোতে হয়। একজন কলেজ শিক্ষিকার দায়িত্ব তাই শুধু পাঠ্যসূচি শেষ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কখনও প্রয়োজন হয় কোনও ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে জানানো, কখনও বৃত্তি বা সরকারি সহায়তার বিষয়ে সচেতন করা, কখনও তার নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে বিশ্বাস তৈরি করা। কোনও ছাত্রী যখন দ্বিধা নিয়ে বলে, “আমি কি

সত্যিই পারব?”, তখন তাকে শুধু বিষয়গত জ্ঞান নয়, নিজের সক্ষমতার উপর আস্থা রাখার সাহসটিও দিতে হয়। এই জায়গাতেই শিক্ষা একটি সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়।

সাউথ মালদা কলেজের মতো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাই শুধু জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র নয়; এগুলি সামাজিক পরিবর্তনেরও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়, আর্থিক শ্রেণি ও সামাজিক পটভূমির ছাত্রীরা পাশাপাশি শিক্ষালাভ করে। পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়, সংকীর্ণ সামাজিক ধারণাগুলির পরিবর্তে যুক্তিবোধ, সহমর্মিতা ও সহাবস্থানের মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু ছাত্রীদের জন্য উচ্চশিক্ষার এই পরিসর তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে। একজন শিক্ষিকা হিসেবে এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা শুধু পেশাগত অভিজ্ঞতা নয়; এটি শিক্ষার প্রকৃত সামাজিক শক্তিকে উপলব্ধি করারও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।

সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক বিষয় হল, একজন মেয়ের শিক্ষাগত অগ্রগতি অনেক সময় তার নিজের জীবনের গতি অতিক্রম করে পরিবার ও সমাজে প্রভাব ফেলে। যে সংখ্যালঘু ছাত্রীটি আজ কলেজে পড়ছে, আগামী দিনে সে হয়তো তার পরিবারের ছোট বোন বা পরবর্তী প্রজন্মের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পথ সহজ করবে। তার সাফল্য পরিবারকে বোঝাবে যে মেয়ের শিক্ষা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উন্নতির বিষয় নয়, পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিরও ভিত্তি। এইভাবেই একজন ছাত্রীর শিক্ষাজীবন ধীরে ধীরে একটি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের অংশ হয়ে ওঠে। বর্তমান ভারত ডিজিটাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ফলে নারীশিক্ষার সঙ্গে ডিজিটাল সাক্ষরতা যুক্ত করা অপরিহার্য। গ্রামের একটি মেয়ে যদি অনলাইনে সরকারি পরিষেবা ব্যবহার করতে পারে, শিক্ষাবৃত্তির আবেদন করতে পারে, ডিজিটাল লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে, অনলাইন কোর্স করতে পারে কিংবা নিজের দক্ষতার ভিত্তিতে কাজের সুযোগ খুঁজে নিতে পারে, তবে শিক্ষা তার কাছে কেবল পরীক্ষার প্রস্তুতি থাকে না—তা হয়ে ওঠে আত্মনির্ভরতার হাতিয়ার।

নারীশিক্ষার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সম্পর্কও অত্যন্ত গভীর। শিক্ষিত ও দক্ষ নারী কর্মসংস্থানে প্রবেশ করলে পরিবারের আয় বাড়তে পারে, সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ে এবং পরিবার অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় তুলনামূলকভাবে সক্ষম হয়। ফলে একজন মেয়ের শিক্ষা দীর্ঘমেয়াদে একটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অংশ হয়ে ওঠে। তবে এই পরিবর্তনের পথে আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। এখনও বহু মেয়ে উচ্চমাধ্যমিকের পর শিক্ষাজীবন থেকে

ছিটকে যায়। কোথাও বাল্যবিবাহ, কোথাও আর্থিক সংকট, কোথাও যাতায়াতের সমস্যা, আবার কোথাও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা তাদের সামনে বাধা তৈরি করে। তাই নারীশিক্ষার প্রসারে শুধু মেয়েদের উৎসাহিত করলেই হবে না; পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন এবং বৃহত্তর সমাজকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

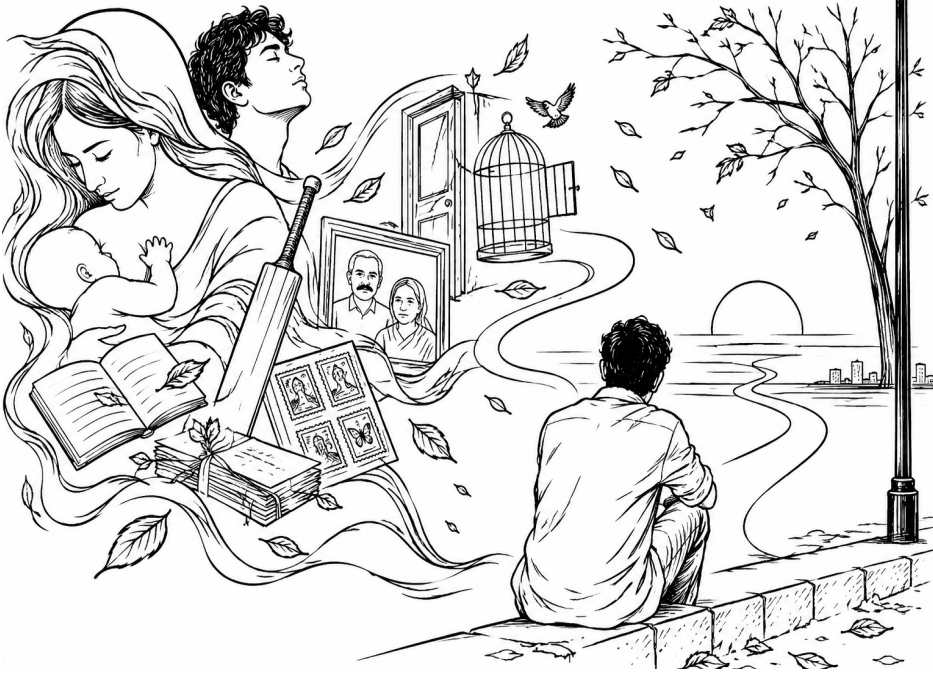
উন্নত ভারতের স্বপ্ন মূলত মানুষের উন্নয়নের স্বপ্ন। সেই উন্নয়নে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পিছনে রেখে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একটি মেয়ে যখন শিক্ষিত হয়, দক্ষ হয় এবং আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে, তখন তার মধ্য দিয়ে দেশের মানবসম্পদ আরও সমৃদ্ধ হয়। নারীকে করুণার দৃষ্টিতে নয়, সম্ভাবনার দৃষ্টিতে দেখা—এটাই আধুনিক ভারতের প্রয়োজন।

জাতীয় উন্নয়ন শুধু বড় রাস্তা, শিল্প, প্রযুক্তি বা পরিকাঠামো দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। একটি প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ের কলেজে পৌঁছতে পারা, নিজের পেশা বেছে নেওয়া, নিজের উপার্জন করা এবং আত্মমর্যাদার সঙ্গে সমাজে দাঁড়াতে পারাও উন্নত ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়। কারণ শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তি তৈরি হয় শক্তিশালী নাগরিক দিয়ে।

সুতরাং নারীশিক্ষার বিস্তার কোনও বিচ্ছিন্ন সামাজিক কর্মসূচি নয়; এটি জাতীয় নির্মাণের অন্যতম প্রধান পথ। যে ভারত তার কন্যাদের হাতে বই তুলে দেয়, তাদের স্বপ্ন দেখার অধিকার দেয় এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে, সেই ভারতই আত্মনির্ভর, মানবিক, জ্ঞানভিত্তিক ও উন্নত ভারতের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত নারীশিক্ষার প্রশ্নটি কেবল মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো বা উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার প্রশ্ন নয়; এটি ভারত কেমন সমাজ ও কেমন ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে চায়, সেই বৃহত্তর প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত। একটি শিক্ষিত মেয়ে নিজের জীবনের পথ আলোকিত করার পাশাপাশি পরিবারকে সচেতন করে, পরবর্তী প্রজন্মকে প্রস্তুত করে এবং সমাজের প্রচলিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। তাই নারীশিক্ষায় বিনিয়োগ মানে কেবল একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নির্মাণ নয়—এটি একটি পরিবার, একটি সমাজ এবং শেষ পর্যন্ত একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণ। “বিকশিত ভারত ২০৪৭”—এর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে হলে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, দক্ষতা, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে আনতে হবে। যে ভারত তার কন্যাদের হাতে বই তুলে দেয়, তাদের স্বপ্ন দেখার অধিকার দেয় এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে, সেই ভারতই জ্ঞান, দক্ষতা, সমতা ও মানবিকতার শক্তিতে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। অর্ধেক আকাশ যখন সমান আলোয় উদ্ভাসিত হবে, তখনই বিকশিত ভারতের আকাশ সত্যিকার অর্থে পূর্ণতা পাবে।

নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা



দিনগুলি মোর

দিন যায়। তাকে
যেতে দিতে হয়।

শত জন্মান্তর জুড়ে এক
আঁকড়ে ধরার
খেলার বাইরে
কাউকে-কাউকে
যেতে দিতে হয়।
মায়ের স্তন্যবৃত্ত, দুধের
কুচি কুচি দাত,
মিহিন কোমল
গলার সে স্বর,
ক্রিকেটের ব্যাট,
কবিতার খাতা,
হলুদ হয়ে যাওয়া
প্রথম প্রেমের
দু' চার আখর,
স্ট্যাম্প অ্যালবাম,
দেওয়ালে পূর্ব
পুরুষের ছবি...

যেতে দিতে হয়।

যেতে দিতে হয়
আত্মজ প্রাণ,
দেশ, দ্বেষ আর
চিরকাল থেকে
যাওয়ার প্রতি
শ্রুতি দেওয়া হাত।
কালো চুল আর
হৃদয়ের জোর,
হঠাৎ হাওয়ায়
ভেঙে যাওয়া দোর,
সোনার খাঁচার
যত রাত-ভোর,
যেতে দিতে হয়।

দিন চলে যায়।
যেতে দিতে হয়।

অপেক্ষা

(“একদিন, যখন সময় হবে, বোসো এই কাব্যের পাশে...”)

কিন্তু সময় খুব গোলমালে, দিনের হিসেবও
জগাই-মাধাই নয়, কলসির কানা মেরে ভুল
বুঝতে পেরে প্রেমে পড়বে, আ যা গলে লাগ যা বললেই
ছুটে এসে বুক খুলে রসভরি আনন্দের কুল-

কুল শব্দে ভরে দেবে! ভাষাটাও তেমন শেখানো
এ জন্মে হলো না বঁধু, তাই পাশে বসার বিলাপ
অর্থহীন মনে হয় এই রাতে। এবং টেবিল
চারপেয়ে, তার সঙ্গে দু'পেয়ে মানুষ মার্কা পাপ

গুলিয়ে ফেলাও বড় অপরাধ। নিয়ো না, নিয়ো না।
চেষ্টা করে দেখো যদি একবার নিতান্তই পারো,
বৃদ্ধের তরুণী কনে, নিমরাজি, যেরকম বসে
বিয়ের পিঁড়িতে, লাল সিঁদুরের মেঘ নিয়ে গাঢ়!

যেমন গোপন কোনও কথাটুকু জানবার তরে
অচেনা আপনজন প্ল্যানচেটে কাছে আনে প্রেত...

‘না বসলে বয়েই গেল’- বলব না। ধুলোরোদশীতে
ফুটপাথে অপেক্ষা করব, স্বর-মাত্রা-অক্ষর সমেত।

রূপালী রায়খরের সোনালী স্বপ্ন

সন্দীপন তালুকদার

আশ্বিনের ফটফটে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে উচ্ছল জলধারা। হয়তো বালুরঘাটের আত্রৈয়ী; তরাই-ডুয়ার্সের তোর্সা, তিস্তা কিংবা রায়ডাক। হটাৎ সেই স্ফটিকস্বচ্ছ প্রবাহিনী যেন কোনো সদ্য বিবাহিতার রূপার গয়নার মতো চক্ চক্ করে উঠল। সবুজের বুক চিরে বয়ে চলা নদীতে চঞ্চল হয়ে উঠল একঝাঁক মাছ। কখনো বা তারা সামান্য লাফিয়ে উঠে জ্যোৎস্না গায়ে মেখেই, আবার ডুব দিল মিষ্টি জলে। আজ আপনি এই প্রশ্ন করতেই পারেন—এ কি নিছক কল্পনা? কোনো রূপকথা? কিন্তু দু’দশক আগেও এই দৃশ্য ছিল উত্তরবঙ্গের নিখাদ বাস্তবতা। আত্রৈয়ী নদীর এই রূপালি বিভাই—উত্তরের অতিপরিচিত ‘রায়খর’ মাছ।

শরতের স্নিগ্ধ ভোরে শিশিরভেজা রাশি রাশি শিউলি ফুল আর নীল আকাশের ক্যানভাসে সাদা তুলোর মত ভেসে থাকা মেঘমালা ঋতুবদলের বার্তা নিয়ে আসে। ঠিক তেমনই একসময় আত্রৈয়ীর টলটলে জলে দেবীর আগমনের দিন গণনার সূচনা করত ঝাঁকে ঝাঁকে রায়খর। বালুরঘাট সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং গ্রামীণ ঐতিহ্যের সাথে এই মাছের আত্মিক বন্ধন ছিল সুগভীর। আত্রৈয়ী নদীর সাথে রায়খরের এই সখ্য ছিল বালুরঘাটের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং নদীমাতৃক জীবনের প্রাণস্পন্দন। এককালে সমগ্র উত্তরবঙ্গের নদীমাতৃক সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল এই মাছটি। শারদীয়া দুর্গাপূজার আবহে ঘরে ঘরে রায়খরের পদ রান্না হওয়া, মেলা-পার্বণে মৎস্যজীবীদের আনন্দ-উৎসব—সব মিলিয়ে এই মাছটি এক অমলিন লোকজ ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এই শতকের গোড়ার দিকেও মাছ বাজার থেকে শুরু করে মধ্যবিত্তের রান্নাঘর— রায়খরের গতিবিধি ছিল অনায়াস। সময় বদলেছে। বিগত কয়েক দশকের বাস্তবতা ভিন্ন। আত্রৈয়ী তো বটেই, এমনকী উত্তরের অন্যান্য নদ নদীতেও কমেছে রায়খরের আনাগোনা। সভ্যতার যান্ত্রিকতার চাপে নদীর কলতান যেমন ক্ষীণ হয়েছে, তেমনই আজ নিজের প্রাকৃতিক বাসভূমি থেকেই নিঃশব্দে হারিয়ে যেতে বসেছে এই মাছ। তবে রায়খরের অস্তিত্ব যদি উত্তরবঙ্গের

প্রাণ থেকে চিরতরে মুছে যায়, তবে কেবল একটি জলজ প্রাণীর অবলুপ্তি হবে না; নিঃশব্দে হারিয়ে যাবে বাঙালির কৃষ্টির এক বহমান ধারা, নদী ও মানুষের দীর্ঘ সহাবস্থানের এক অনন্য নিদর্শন। বাঙালির ভূরিভোজ আর লোকাচারের এই রূপালি যোগসূত্র ছিঁড়ে গেলে বিষাদের ছায়া ঘনাবে খোদ ‘বাঙালিয়ানা’য়।

নামে কিবা আসে যায়: উত্তরবঙ্গের রূপালি পরিচয়

রায়খর মাছের ভৌগোলিক বিস্তার কেবল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। এক কালে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মিষ্টি ও ক্ষারীয় জলজ পরিবেশেই ছিল এই মাছের বিচরণভূমি। এখন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে এই মাছ ‘রায়খর’ বা ‘রূপালি মাছ’ নামে খ্যাত; তরাই ও ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার, মাদারিহাট বা কোচবিহারের নদী অববাহিকায় এদেরই নাম ‘রায়েক’ বা ‘রাইচ্যাণ্ড’। আর এরা আসামে পরিচিত ‘লাছিম’ বা ‘রাসিম’ নামে। সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে কোথাও এদের বলে ‘টাকিলা’, কোথাও ‘তাতকিনি’ আবার কোথাও ‘রেবা’ বা ‘আইখোর’। তবে বিজ্ঞানীরা এদের নাম রেখেছেন—*Cirrhinus reba* (Hamilton, 1822)। এরা কার্প বা পোনা জাতীয় মাছ; সাইপ্রিনিডি পরিবারের অন্তর্গত। বাহ্যিক গঠনে অনেকটাই রুই বা বাটার সম তুল্য। তবে আকৃতিতে রুইয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, দৈর্ঘ্য সাধারণত ১৫ থেকে ৩০ সেমি এর মধ্যেই। ঠোঁটের সুনির্দিষ্ট গঠন এবং ওপরের কষে একজোড়া অত্যন্ত ছোট গৌঁফ এদের অন্যতম সানাক্ষরক বৈশিষ্ট্য। গায়ের রূপালি আঁশের উপরিভাগে হালকা লালচে বা গোলাপি আভা আর শরীরে মিহি কালচে ডোরাকাটা দাগই একে বাটা সহ অন্য সমগোত্রীয় মাছেদের থেকে আলাদা করে।

জীবনপঞ্জি ও পরিযান: প্রকৃতির অনন্য রূপকথা

রায়খর মূলত মিষ্টি জলের তলদেশের মাছ। নদী বা বড় জলাশয়ের পলি, শ্যাওলা, ছোট জলজ উদ্ভিদ এবং অনুজীব এদের প্রধান খাদ্য। রায়খরের জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায় হলো এদের প্রজনন ও জলজ পরিজান। বর্ষার প্রারম্ভেই, জুন থেকে সেপ্টেম্বর—রায়খরের প্রজননকাল শুরু হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী রায়খর প্রজনন মরসুমে দেহের ওজন ও দৈর্ঘ্য ভেদে গড়ে কুড়ি হাজার থেকে শুরু করে আড়াই লক্ষ পর্যন্ত ডিম ছাড়তে সক্ষম। এদের প্রজননের

জন্য প্রয়োজন শ্লথ কিন্তু গতিশীল জলস্রোত এবং নদীকূলের জলজ ঘাস বা লতা-পাতা ঘেরা শান্ত পরিবেশ। ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশের বিখ্যাত চলনবিল এবং নিম্নাঞ্চলীয় আত্রাই নদীপ্রবাহের সাথে উত্তরবঙ্গের আত্রৈয়ীর নিবিড় যোগ ছিল। প্রজনন মরসুমে চলনবিল ও আত্রাই থেকে উজানে ভেসে উঠত রায়খরের ঝাঁক। বর্ষার নতুন জলে নদী যখন উপচে উঠত, উজানবেয়ে আসা রায়খরের প্রজনন-পরিযান যেন আত্রৈয়ীর বুক জুড়ে নতুন প্রাণের জোয়ার আনতো।

হলং থেকে বালুরঘাট: মনের স্বাদ ও স্মৃতির ঐতিহ্য

খাদ্যরসিক বাঙালিদের কাছে রায়খরের কদর ছিল অপরিসীম। অত্যন্ত সুস্বাদু তেলতেলে স্বাদের সঙ্গে, সুপাচ্য হওয়ার জন্য মাছটি ভোজনরসিকদের কাছে ছিল অত্যন্ত পছন্দের। ঐতিহাসিক হলং বনবাংলো হোক কিংবা বালুরঘাট সার্কিট হাউসের ‘ভিসিটর্স বুক’—এ লিপিবদ্ধ একাধিক মন্ত্রী, প্রবীণ আমলা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্যে এই মাছের প্রশংসার চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তিস্তা-তোসার বিখ্যাত ‘বোরোলি’ মাছকে ঐতিহ্য আর স্বাদে টেকা দিতে পারত রায়খর। প্রতিদিনের কালোজিরে-কাঁচালঙ্কার পাতলা ঝোল বা অনুষ্ঠান বাড়ির সরষে-পোস্ত, কিংবা পালং বেগুন সহযোগে চচ্চড়িতে রায়খরের স্বাদ আজও ভোজনরসিক মাঝবয়সী বঙ্গসন্তানের জিভে জল এনে দেয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাজারের ব্যাপক চাহিদা ও নামমাত্র জোগানের টানা পোড়েনে এই মাছের দামের পর্যায়ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। বছর কুড়ি আগেও বালুরঘাট থেকে আলিপুরদুয়ারের হাটে-বাজারে সুস্বাদু নদীর রায়খর দেদার বিকাত দু’শ থেকে আড়াই’শ টাকা কেজি দরে। এখন বাজারে এর আকস্মিক উপস্থিতিতে, থলে হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মধ্যবিত্ত ভোজনরসিককে চমকে দিয়ে, এর দাম উঠে যায় কেজি প্রতি হ’শ, সাত’শ এমনকি সময়ভেদে ও ক্ষেত্রবিশেষে আট’শ থেকে হাজার টাকায়! মূল্যের এই আকাশচুম্বী উল্লঙ্ঘন এবং স্থানীয় বাজারে ক্রেতাদের মধ্যে এই জনপ্রিয়তা—এরই ‘ভুল-ভুলাইয়ায়’ আটকা পড়েছে নদীর বাস্তুতন্ত্র। বাজারে আকাশছোঁয়া দাম পাওয়ার বিপুল প্রলোভন সামলাতে পারেন না প্রান্তিক মৎস্যজীবীরা। ফলে নদীতে রায়খরের ঝাঁকের সামান্য আভাস পেলেই অমনি জলে নেমে পড়ে অসংখ্য মশারি জাল। দামের সেই অপ্রতিরোধ্য

মোহে ডিম্বাণুযুক্ত পূর্ণবয়স্ক মাছ কিংবা অতি ক্ষুদ্র ধানিপোনা—কাউকেই রেহাই দেওয়া হয় না।

নদীর কোল খালি করে নির্বিচারে মাছ শিকারই আজ রায়খরের নিঃশব্দ অবলুপ্তির অন্যতম প্রধান অনুঘটক হয়ে উঠেছে।

জল শুকোয়, মন শুকোয়: টান পরে রূপালি মায়ায়

আন্তর্জাতিক মৎস্য সংরক্ষণ সংস্থা-র আঞ্চলিক সমীক্ষা নিশ্চিত করেছে যে, বাংলাদেশ ও ভারতের আত্রৈয়ী অববাহিকায় বিষাক্ত বর্জ্য নিঃসরণ এবং অনিয়ন্ত্রিত দূষণের কারণেই এই অঞ্চল থেকে রায়খর কার্যত উধাও হয়ে যাচ্ছে। কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে মানুষ ও পরিবেশের যৌথ উদাসীনতার এক করুণ ছবি ফুটে ওঠে। দুই বাংলার অন্তরবর্তী নদীসমূহে অনিয়ন্ত্রিত সুইস গেট এবং বাঁধের কারণে নদীর প্রবাহমানতা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গিয়েছে। চলনবিলের সাথে আত্রৈয়ীর সংযোগ ক্ষীণ হওয়ায় রায়খরের প্রাকৃতিক পরিযান পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

একইসাথে নদী তীরবর্তী কৃষিজমিতে ব্যবহৃত ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীতে মিশছে, যা রায়খরের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করছে এবং এদের ডিম ফুটতে বাধা দিচ্ছে। অন্যদিকে আইনের তোয়াক্কা না করে সুক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত ‘নিষিদ্ধ’ জাল দিয়ে একই সঙ্গে ডিমভর্তি স্ত্রী মাছ বা অপরিণত পোনা শিকার করা হচ্ছে। তার ওপর নদীর জলে কারেন্ট জাল বা বিষ প্রয়োগ করে নির্বিচারে মাছ ধরার মতো বেপরোয়া কার্যকলাপ বাস্তুতন্ত্রের চরম ক্ষতি করছে। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং নদীতে পলি জমার ফলে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে শুষ্ক মরসুমে নদী কার্যত শুকিয়ে নালায় পরিণত হচ্ছে। আত্রৈয়ী যত বিপন্ন হচ্ছে, যতই তার গভীরতা কমছে, ততই ফিকে হচ্ছে তার রূপালি আভা।

জলদূষণের নীরব সাক্ষী: জৈব নির্দেশক রায়খর
সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা, নদী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রায়খর মাছকে বিজ্ঞানের এক নতুন অলিন্দে এনে দাঁড় করিয়েছে। গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, রায়খর নদীদূষণের অত্যন্ত সংবেদনশীল এক জৈব নির্দেশক বা ‘বায়ো-ইন্ডিকেটর’। গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নদীতে ভারী ধাতু (যেমন ক্রোমিয়াম, সীসা, পারদ ইত্যাদি), ক্ষতিকর মৌল (যেমন আর্সেনিক, ফ্লুরাইড ইত্যাদি), শিল্পবর্জ্য বা কৃষি-কীটনাশকের মাত্রা সামান্য বৃদ্ধি

পেলেই তা রায়খরের শরীরে চরম অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি করে। নদীর জল দূষিত হলে মাছটির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ—বিশেষ করে ফুলকা ও যকৃতের কলাহানিক গঠনে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন স্পষ্ট ধরা পড়ে। সংবেদনশীল এই প্রজাতিটি দূষিত জলে বেঁচে থাকতে পারে না; ফলে নদীর জলে রাসায়নিক বা বর্জ্যের মাত্রা বিপদসীমা ছুঁলেই জলজ বাস্তুতন্ত্রে সবচেয়ে আগে রায়খরের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেয়। অর্থাৎ, নদীতে রায়খরের উপস্থিতিই বলে দেয় নদীর জল কতটা বিশুদ্ধ ও প্রাণবন্ত। আর এর বিলুপ্তি নদীর বিপন্নতারই এক অকাটা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বহন করে।

আশার আলো: পুকুরে চাষ ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

বাঙালির পাত থেকে রায়খর যেন পুরোপুরি মুছে না যায়, তার জন্য এখন উদগ্রীব রাজ্য প্রশাসন ও পরিবেশপ্রেমীরাও। বর্তমানে রাজ্য মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে প্রাকৃতিক দীঘি ও পুকুরে, রুই-কাতলার মত তুতো ভাইদের সঙ্গে রায়খরকে সম্মিলিত করে নিবিড় মিশ্র চাষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর ফলে আগামীতে রায়খর অনুরাগী ভোজন রসিকদের পাতে এর যোগান সুনিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে এ'কথা সত্যি যে বদ্ধ জলাশয়ে এই মাছের প্রতিপালন সফল ভাবে করা গেলেও, সেখানে (প্রাকৃতিক ভাবে) এদের প্রজনন সম্ভব হয় না। আশার কথা, আধুনিক প্রণোদিত প্রজনন ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃত্রিম জলাশয়ে এদের বংশবৃদ্ধির প্রচেষ্টা পরীক্ষামূলক ভাবে সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সাধারণ মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে মৎস্যপ্রেমীদের মনে জেগেছে তীব্র শঙ্কা—”পুকুরের রায়খরে ঘোলের তেষ্ঠা মিটলেও দুধের স্বাদ হয়তো মিলবে না।” প্রবাহমান নদীর প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে বড় হওয়া রায়খরের যে সুস্বাদু নির্যাস ও মিষ্টি স্বাদ, তা আদপেও বদ্ধ জলাশয়ে স্বয়ং লালিত এবং কৃত্রিম মৎস্যখাদ্যে পালিত মাছে মিলবে কি? এর উত্তর হয়তো আগামী দিনে দিতে পারবে ভোজন রসিকদের রসনা।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত সরকারের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সি. আই.এফ.আর.আই.) এবং ‘জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন পর্যদ’ (ন্যাশনাল ফিশেরিজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড) এর গবেষণা ও সমীক্ষায় নদীজাত দেশীয় মাছ সংরক্ষণের বেশ কয়েকটি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। গঙ্গা ও তার অববাহিকার বিভিন্ন উপনদীতে হারিয়ে যেতে বসা দেশীয় কার্প ও অন্যান্য মিঠে জলের মাছের পোনা নিয়ন্ত্রিত উপায়ে মুক্ত করার বিশেষ ‘রিভার র্যাঞ্চিং’ কর্মসূচি সি.আই.এফ.আর.আই. পরিচালনা করেছে। তাই চাষের পাশাপাশি, মাঝেমাঝেই মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে আত্রেয়ী বা তোসার মতো নদীতে রায়খরের পোনাও ছাড়া হচ্ছে, যাতে নদী তার হারানো প্রাণ ফিরে পায়। আর ভোজন রসিক মেহো বাঙালির পেটের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যাতে ভরে। তবে বর্ষাকালে মাছের ডিম পাড়ায় সময়ে জাল ফেলার ওপর আইনি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোতে উভয় দেশের সমন্বিত নজরদারির অভাবে সবসময় তার সুফল মিলছে না। নদীর স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষেত্রগুলো রক্ষায় কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সফল হলেও নদীর উন্মুক্ত জলে এদের স্বাভাবিক সংখ্যা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন সমন্বিত সংরক্ষণ নীতি।

রাজনৈতিক মানচিত্রের উর্ধ্বে: ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সংরক্ষণের অঙ্গীকার
রায়খর মাছের স্বাভাবিক বাসস্থান এবং বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি কোনো একক ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। উত্তরবঙ্গের নদ নদী যেমন সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের পদ্মা ও তার উপনদীগুলোতে মিশেছে, তেমনি সেদেশের চলনবিলের বিস্তৃত জলাভূমির সাথেও এদের অস্তিত্ব ও জলজ বাস্তুতন্ত্রের গভীর সংযোগ রয়েছে। নদীর এই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের কারণে বাংলাদেশের নদীদূষণ বা অনিয়ন্ত্রিত মাছ শিকার ভারতে রায়খর মাছের অস্তিত্ব টান ফেলে। আবার প্রজননক্ষেত্রগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের নদীতেও এই ঐতিহ্যবাহী মাছের আকাল দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক সীমান্তের বাস্তবতা এবং উপযোগী কূটনৈতিক নীতিমালা নদীপ্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারলেও জলজ জীববৈচিত্রে ও পরিমানের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অধিকাংশ সময়ই যথেষ্ট প্রশ্নবোধক।

বাস্তবিক অর্থে, গঙ্গা অববাহিকায় বিপন্ন দেশীয় মৎস্যসম্পদ রক্ষায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক মৎস্য সমঝোতা স্মারক (এম.ও.ইউ.) ও কৌশলগত নীতিপত্র গঠিত হলেও, রায়খরের মতো নির্দিষ্ট ছোট দেশীয় নদীর মাছ সংরক্ষণে এখনও দৃশ্যমান ও বাস্তবসম্মত কোনো যৌথ ক্ষেত্র-অভিযান বা সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত

হয়নি। অথচ আত্রেয়ী নদী এবং তার বুক জুড়ে খেলা করা রায়খরের প্রজননচক্র কোনো রাজনৈতিক সীমানা বা ভূ-রাজনৈতিক কূটনীতির সমীকরণ মেনে চলে না। তাই ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক মানচিত্রের ঘেরাটোপের উর্ধ্বে উঠে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশকেও নদীর সার্বিক স্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় একাত্ম হতে হবে। রায়খরকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে সর্বাত্মক প্রয়োজন স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিশেষ ‘টাস্ক ফোর্স’ গঠন করা, যারা তৃণমূল স্তরে সমীক্ষা চালিয়ে বাস্তব পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবে। বাস্তবসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন ও তার যথোপযুক্ত কার্যকর বাস্তবায়ন তবেই সম্ভব। উভয় দেশের যৌথ নদী কমিশন, সি.আই.এফ.আর.আই. এবং বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণা সংস্থার বৈজ্ঞানিক সহযোগিতায় আন্তঃসীমান্ত ‘ফিশ স্যাক্সচ্যুরি’ বা ‘মৎস্য অভয়ারণ্য’ গড়ে তোলার কথাও ভাবা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন আই.ইউ. সি.এন. ও এফ.এ.ও.—এর সহায়তা নিয়ে সীমান্তবর্তী নদীগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনা এবং দুই পারের মৎস্যজীবীদের যৌথ বিকল্প জীবিকার বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা এই বিপন্ন মাছের জন্য রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আত্রেয়ীর বুক রায়খরের রূপালি ঝিলিক সকলের মনেই নতুন আশার আলো জ্বলছে। এখনো আছে সময়! প্রকৃতি এখনও তার ঐশ্বর্য ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত—প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা, সঠিক পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপের।

অতএব...

রায়খরকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। নদীমাতৃক বাংলার শ্যামলিমায় মিশে আছে জল ও জীবনের নিবিড় আখ্যান। নদীকে সুরক্ষিত রাখতে পারলে তার মাছও সুরক্ষিত থাকবে। প্রকৃতিরূপী মাতৃশক্তির সাফল্যেই সুনিশ্চিত হবে তার মীন সন্তানদের ভবিষ্যৎ। আর তাহলেই স্বর্গের টিকে থাকবে বাঙালিয়ানার ঐতিহ্য। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে রায়খরকে খুঁজে পায় কোনো জ্যোৎস্নান্নাত রাতে আত্রেয়ীর স্নিগ্ধ গতিধারায়; প্রিয়জনের রান্না করা রায়খরের স্বাদ উপভোগ করতে পারে কালোজিরে কাঁচালঙ্কার পাতলা ঝোলে। আগামীর জীবনে রায়খরের অস্তিত্ব যাতে সীমাবদ্ধ না হয়, শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ার আর্কাইভে; কিংবা মাসিমা কাকিমাদের পুরানো রান্নার খাতার হলুদ মাখা বিবর্ণ পাতায়।

বন্দে মাতরমের বন্দে মাতরম ও দুর্গা ভাবনা

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়



ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা ভারত প্রেমের অন্যতম প্রতীক বন্দে মাতরম গীতি। এর সুগঠিত লেখনী আর সুললিত ছন্দে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী যুগ থেকে যুবকদল ঘর ছেড়ে দেশাত্মবোধক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। এই অনন্য গীতি সর্বপ্রথম রাজনৈতিক শ্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হয় ১৯০৫ সালের ০৭ অগস্ট। কলকাতার টাউন হলে যে ঐতিহাসিক সভায় বিদেশী দ্রব্য বয়কট মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেখানে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ ‘বন্দে মাতরম’ শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলেন। লর্ড কার্জন পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে-ই এই গানটি গাইবে তাকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। আবার দেখি, ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে বাংলার রংপুরের একটি স্কুলের দুশো জন ছাত্রের প্রত্যেককে বন্দে মাতরম উচ্চারণের অপরাধে পাঁচ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছিল।

পৃথিবীর গণআন্দোলনের ইতিহাসে আমরা লক্ষ্য করি ‘লা মার্সিইয়েজ’ গান যেমন ফরাসী বিপ্লবে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দীপক গান হয়ে উঠেছিল অথবা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনে ‘দ্য ফগি ডিউ’ গানটি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, তেমনি বন্দে মাতরম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোটি কোটি ভারতবাসীকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

দেখা যায় এই গান মনের মধ্যে এমন এক

আধ্যাত্মিক প্রেরণা জোগায় যার উচ্চারণে অন্তরমধ্যে বিপুল শক্তির উদয় হয়, মানুষ অকুতভাবে দেশমাত্রিকার সেবায় নিয়োজিত হতে পারে। তাই শ্রীঅরবিন্দ সঙ্গতভাবেই বলেছেন, ‘বন্দে মাতরম’—এর মধ্যে জনগণের সমষ্টিগত চেতনা জাগিয়ে তোলার মতো অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে। তিনি মনে করতেন যে, বন্দে মাতরম পাঠ করা কেবল একটি রাজনৈতিক কাজ নয়, বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক কাজ, যা মানুষকে এক গভীরতর অনুধ্যানে নিয়ে যায় এবং অভিন্নতা বোধে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করার উৎসাহ দেয়।

একথা ঠিক যে পৃথিবীর সমূহ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস যুগবদ্ধ আন্দোলন ও সমষ্টিগত চেতনার মাধ্যমেই সংগঠিত হয়েছে। ইতিহাসও প্রমাণ রেখেছে কোনো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় সমাজে পরিবর্তন আসেনি। আবার যুগবদ্ধ হলেই যে পরিবর্তন হবে এমনটাও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সকলের মধ্যে ‘আমরা বোধ’ বা ‘আমরা সকলেই সমভাবে বঞ্চিত ও নীপিড়িত এই অনুভূতির উদ্বেক হয়। মার্কসীয় শ্রেণি চেতনার উন্মেষে সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা মোটেই অগ্রাহ্য করার মতো নয়। বন্দে মাতরম গানের ভাষা, উচ্চারণ সত্য—সত্যিই ভারতবাসীর ঐক্যবোধের চেতনার উদ্বেক করেছিল এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণাদানকারী শক্তি হয়ে উঠেছিল।

১৮৭৫ বঙ্গদর্শনে বন্দে মাতরমের প্রথম প্রকাশের

পর, আনন্দমঠ উপন্যাসের মূল ভাবনায় গানটি যুক্ত হয়। এই উপন্যাসের উপজীব্য ছিল সন্তান নামের সন্যাসীদের মাতৃভূমির জন্যে জীবন উৎসর্গের কাহিনী। সেই সন্তানদল যারা এই ভারতবর্ষকে দেখেছিল দেবীমূর্তি হিসেবে। আমরা দেখতে পাই উপন্যাসের সেই অসাধারণ দৃশ্য যেখানে পদচিহ্ন গ্রামের অনতিদূরের জঙ্গলে সন্তানদলের সঙ্গে নবাবের সেপাহীদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর যখন মহেন্দ্র সিং আর ভবানন্দ “জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নীরব প্রান্তর” পার হয়ে চললেন, মহেন্দ্র দেখলেন ভবানন্দের মধ্যে পূর্বকালের হাবভাব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে গেছে। “সেই রণনিপুণ বীরমূর্তি, সৈন্যধ্যক্ষের মুণ্ড ছেদনকারী মূর্তি আর নেই।” ভবানন্দ সে সময় “হাস্যমুখ, বাঙময়, প্রিয়সম্ভাষী” হয়ে উঠেছে। ঠিক সেই সময় ভবানন্দ গাইছেন, “বন্দে মাতরম, সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্ শস্যশ্যামলাং মাতরম।”

মহেন্দ্র এ গান শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে? এর উত্তর না দিয়ে ভবানন্দ গাইলেন— ‘শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকীতযামিনীম্, ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভনীম্, সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্, সুখদাং বরদাং মাতরম।’ মহেন্দ্রের এরপর পুনরায় জিজ্ঞাসা— “এত দেশ, এত মা নয়।” এর উত্তরে ভবানন্দের মাধ্যমে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতপ্রেমের যে অসাধারণ ভাবটি ব্যক্ত করেছেন তার মূল কথাই হল— জন্মভূমিই প্রকৃত জননী। যারা প্রকৃত দেশসেবক তাদের তথাকথিত মা, বাপ, স্ত্রী,

পুত্র, ভ্রাতা নেই। তার ঘর নেই, বাড়ি নেই, আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়সমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা ভারতভূমি।

আমরা দেখি, ‘বন্দেমাতরম’র পরবর্তী অংশে মাতৃভূমির যে রূপ প্রকাশিত হয় তা আরও স্পষ্টভাবে দেবীমূর্তির সঙ্গে যুক্ত। বলা হয়েছে— “তুমি হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী / কমলা কমলদলবিহারিণী / বাণী বিদ্যাদায়িনী...”

দেখা যায়, ভারতবর্ষকে একদিকে দুর্গা, অন্যদিকে লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর প্রতীকে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই প্রতীকগুলির দার্শনিক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গা শক্তির প্রতীক, লক্ষ্মী সমৃদ্ধির প্রতীক, সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যার প্রতীক। একটি আদর্শ জাতির বিকাশের জন্যে তিনটি মৌলিক শক্তির প্রয়োজন— শক্তি, সমৃদ্ধি ও জ্ঞানের। কেবল শক্তি থাকলেই একটি জাতি উন্নত হতে পারে না, জ্ঞান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রয়োজন সেই জাতির স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে। এ অর্থে বন্দে মাতরম—এর দেবীভাবনা একটি সমন্বিত জাতীয় আদর্শের প্রতীক।

আবার আনন্দমঠ উপন্যাসের গভীরে প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাই ভবানন্দ মহেন্দ্রকে নিয়ে আনন্দকাননের আনন্দমঠে নিয়ে গেলেন, সেখানে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ ঠাকুর মহেন্দ্রকে তিনটি দেবীমূর্তি দর্শন করাচ্ছেন।

প্রথম মূর্তিটি জগদ্ধাত্রী। তিনি সুসজ্জিতা, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। এই মূর্তির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের গৌরবময় অতীতের প্রতীক নির্মাণ করেছেন—যে ভারত একসময় জ্ঞান, সংস্কৃতি, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় মূর্তিটি কালী। এই মূর্তি ভয়ংকর, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ধ্বংসের চিহ্ন বহন করে। এটি পরাধীন ও দুর্দশাগ্রস্ত সমকালীন ভারতের প্রতীক। তৃতীয় মূর্তিটি মা দুর্গার। দুর্গা এখানে শক্তি, সাহস ও বিজয়ের প্রতীক। তাঁর হাতে অস্ত্র এবং তিনি অসুরবিনাশিনী। এই মূর্তির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যতের পুনরুজ্জীবিত, শক্তিশালী ও স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন প্রকাশ করেছেন।

এখানে আমরা তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি— তিনি দেবী দুর্গার ছায়ার ভারতমাতার বন্দনা করছেন কেন?

আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের

নিজস্ব লেখায়। আমরা যুক্তির আকারে এ বিষয়টিকে তুলে ধরতে পারি।

প্রথমত, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম বা একমেবাদ্বিতীয়ম চৈতন্য বা হার্বাট স্পেনসার যাকে Inscrutable Power in Nature বলেছেন তা দার্শনিক ঈশ্বর হলেও, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। সগুণ ঈশ্বর যাকে পারশোনাগ গড বলি তার উপাসনাই ধর্মের আদর্শ হতে হবে। দেবী দুর্গা যে সগুণ সাধনার অন্যতম প্রাচীন প্রতীক তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন কৃষ্ণ এবং দুর্গা এই বঙ্গদেশের প্রধান আরাধ্য দেবতা এবং এই বঙ্গদেশই স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি। কেবল পূজা নহে, কৃষ্ণভক্তি ও দুর্গাভক্তি এ দেশের লোকের সর্বকর্মব্যাপী হইয়াছে। দুর্গে “দুর্গে” “দুর্গাতিনাশিনি” ইত্যাদি শব্দ অনেকের প্রতিনিঃশ্বাসেই নির্গত হয়।

তৃতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় শক্তির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। শক্তি ব্যতিরেকে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী চিন্তার উদয় হতে পারে না। এখানে শক্তি কেবল সামরিক শক্তি নয়। শক্তি বলতে বুঝতে হবে বৌদ্ধিক ও আর্থিক শক্তিকেও। দেবী দুর্গার দশহাতে থাকা দশরকম জিনিস বিভিন্ন শক্তির প্রতীক। যেমন গণেশ দেবী দুর্গাকে দিয়েছিলেন, তলোয়ার। তলোয়ারের ধার বুদ্ধি শক্তির প্রতীক। আবার ব্রহ্মার দেওয়া পদ্ম আধ্যাত্মিক চেতনশক্তি বিকাশিত হওয়ার প্রতীক। বিষ্ণুর দেওয়া চক্র হল মানসিক দৃঢ়তা ও সংহতির শক্তি বিকাশের প্রতীক।

তবে একথা বলতেই হয় যে শক্তির প্রকৃত মূল্য তখনই, যখন তা ন্যায় ও বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। দেখা যায় ‘সপ্তকোটিকণ্ঠ কল কল নিনাদে’, দ্বিসপ্তকোটীভূজৈধ্বতখর করবালে’ প্রভৃতি শব্দবন্ধের ব্যবহারে বন্দেমাতরমের দর্শনে ব্যক্তি নিজেকে বৃহত্তর জাতিসত্তার অংশ হিসেবে উপলব্ধি করতে শেখে। নিজের স্বার্থকে অতিক্রম করে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার আহ্বান পায়। আমরা দেখি

এই ত্যাগ কেবল পরের তরে জীবন উৎসর্গ অর্থে নয়। অশিক্ষা, অসততা, সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান এবং দেশের মানুষের কল্যাণে

কাজ করাও স্বদেশসেবার অংশ হতে পারে। মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা তখনই অর্থপূর্ণ, যখন তা দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্বে রূপান্তরিত হয়। যদি আমরা দেশকে ‘মা’ বলি, তবে দেশের দরিদ্র মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, নারী, শিশু এবং প্রান্তিক মানুষের কল্যাণও সেই মাতৃভূমির সেবার অংশ হয়ে ওঠে। ফলে ‘বন্দেমাতরম’—এর প্রকৃত দর্শনকে কেবল দেশকে বন্দনা করার মধ্যে নয়, বরং দেশের মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

আজকের ভারতবর্ষে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতার ও আত্মকেন্দ্রিকতার যে অদ্ভুত বিষদন্ত বিরাজ করেছে, কবির ভাষায় বলা যায়— ‘আমরা এক বামন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি’। এই সময়ে দাঁড়িয়ে ‘বন্দেমাতরম’—এর দর্শন নতুনভাবে পাঠ করা প্রয়োজন। এর মূল শিক্ষা হতে পারে— দেশকে ভালোবাসা মানে দেশের প্রকৃতিকে রক্ষা করা; দেশকে ভালোবাসা মানে মানুষত্বকে রক্ষা করা; দেশকে ভালোবাসা মানে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার ঘটানো; দেশকে ভালোবাসা মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নৈতিকভাবে দাঁড়ানো; দেশকে ভালোবাসা মানে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করা।

অর্থাৎ দেশপ্রেম যখন ভক্তির আলোকে মানবকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখনই তা প্রকৃত নৈতিক মূল্য লাভ করে।

তথ্যসূত্র:

১. *Backgrounders, Press Information Bureau, Government of India, 150 Years of Vande Mataram, November, 2025* ২. <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/nov/doc2025116686201.pdf>

৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ, সম্পাদক: শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৮৫, পৃ. ২২।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধর্মতত্ত্ব, সম্পাদক: শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ.

শান্তির খোঁজে

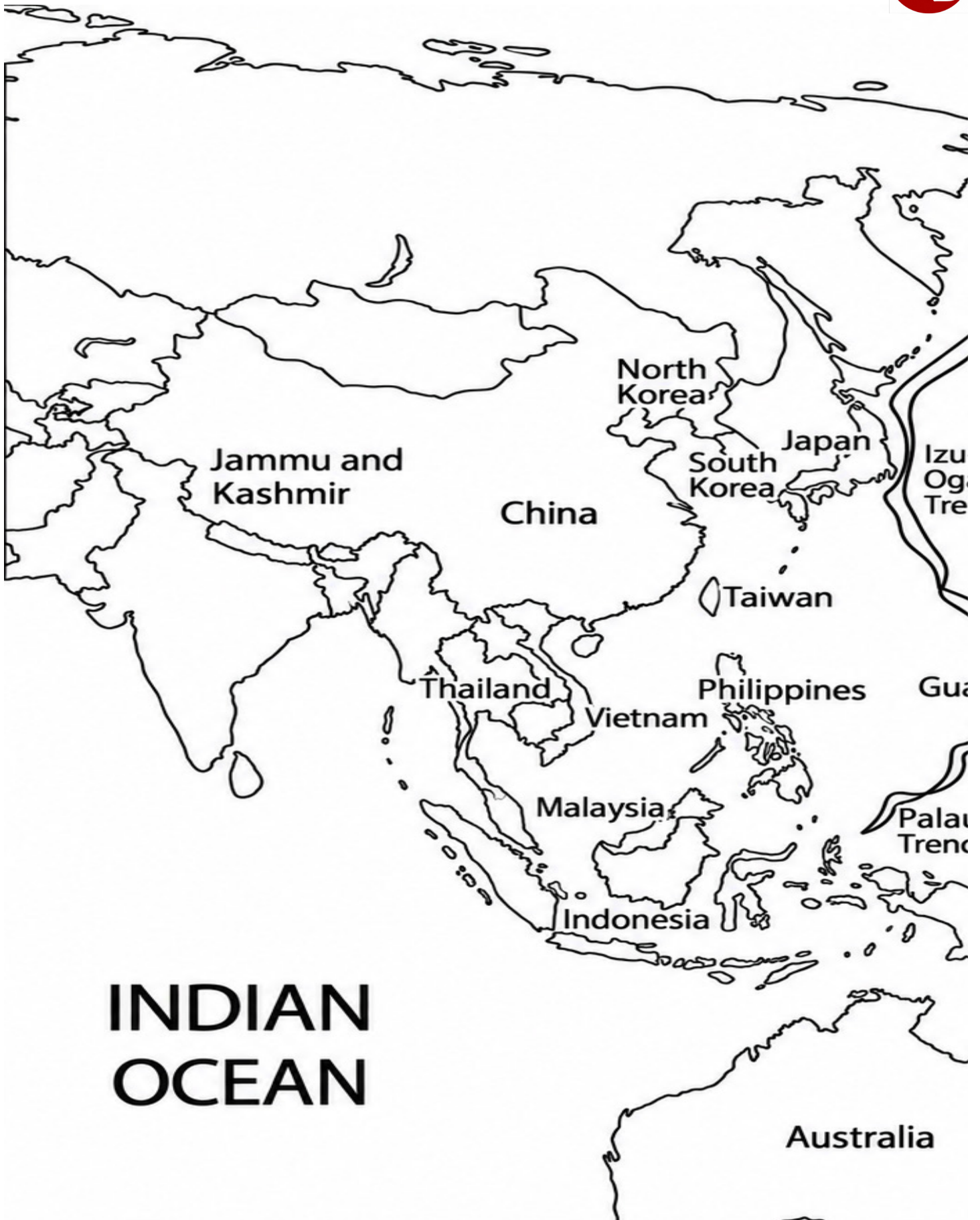
অমিত দত্ত

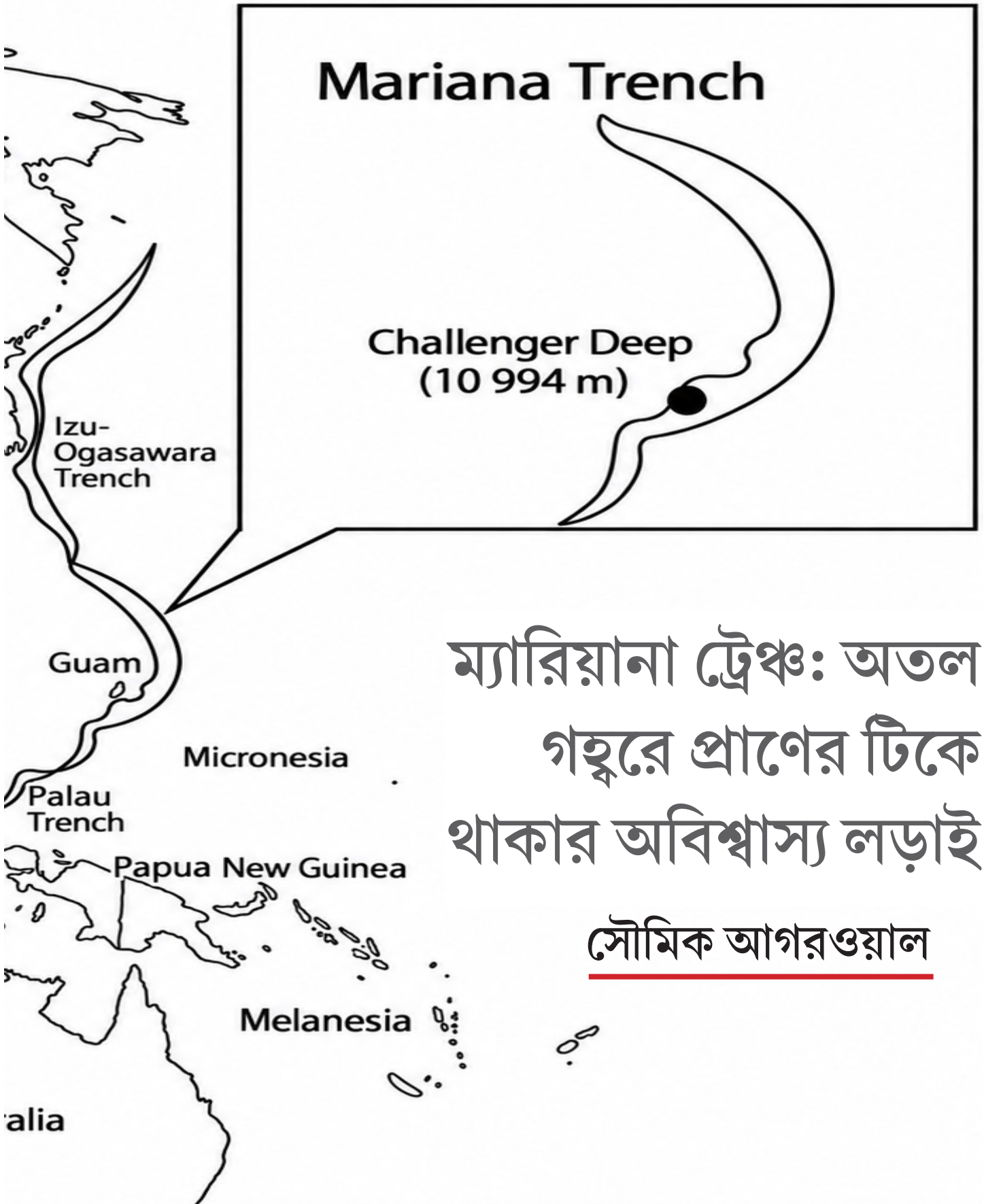






সমাপ্ত





ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ: অতল
গহ্বরে প্রাণের টিকে
থাকার অবিশ্বাস্য লড়াই

সৌমিক আগরওয়াল

এ ইবারের দুর্গাপুজোর ছুটিতে শিবাজি আর সন্দীপন ঠিক করল দীঘা বেড়াতে যাবে। মনে ভীষণ আনন্দ, সমুদ্রের ধারে সুন্দর একটা হোটেলে থাকবোযদিও টাকা-পয়সার একটু টান আছে, কিন্তু তারা জানত যে সমুদ্রের ধারে এত হোটেলের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা না একটাতে জায়গা পেয়ে যাবে। মনের আনন্দে দুই বন্ধু পৌঁছল দীঘা, গিয়ে দেখে সব হোটেল ভর্তি, নয়তো দামের ঠেলায় ভুবন অন্ধকার। খুঁজতে খুঁজতে শেষে সমুদ্র থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা গলির ভেতরে দুই বন্ধুর থাকার জায়গা হলো। জায়গাটা একটু দূরে ঠিকই, কিন্তু তাতে কী! সমুদ্রের ধারে দীঘাতে জম্পেশ খাওয়া-দাওয়া এবং বন্ধুর সঙ্গে ছুটিটা দারুণ কাটল।

ঠিক আমাদের জীবনও অনেকটা একইরকম; যাত্রা শুরুর আগে দুই বন্ধু যেমন ভেবেছিল, যে তারা সমুদ্রের ধারে সুন্দর একটা ঘরে থাকবে, এটাই ছিল তাদের ইচ্ছা বা কল্পনা। কিন্তু শেষে পরিস্থিতির চাপে দুই বন্ধুর স্থান হলো সমুদ্র থেকে দূরে, গলির মধ্যে একটা ঘরে। তাদের ইচ্ছা বা সম্ভাবনা যা ছিল, আর যা হলো, তার মধ্যে কিছুটা ফারাক থেকে গেল। জীববিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে “ফান্ডামেন্টাল নিশ” এবং “রিয়েলাইজড নিশ” দিয়ে বোঝা যায়। পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণীর একটি নিজস্ব “ফান্ডামেন্টাল নিশ” বা মূল বাসস্থান থাকে— এটি এমন একটি বিশাল এবং সম্ভাবনাময় জায়গা যেখানে সে বসবাস করতে পারে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির চাপে প্রাণীরা বেঁচে থাকার জন্য যে স্থানটিকে তারা বেছে নেয় তাকে “রিয়েলাইজড নিশ” বলা হয়। মানুষের ব্যাপারটাই ধরা যাক। আমরা প্রাকৃতিকভাবে আরামদায়ক নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এবং মিষ্টি জলের কাছাকাছি থাকতে চাই। কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখতে পাবো, মানুষ বরফে ঢাকা সুমেরু, তপ্ত সাহারা মরুভূমি বা উঁচু পাহাড়েও বসবাস করেছে এবং করছে। কারণ, আরামদায়ক জায়গাগুলোতে ভিড় বাড়লে বা বিপদ এলে, প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য চরম পরিবেশেও মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

টিকে থাকার এই অদম্য লড়াই প্রাণীদের সমুদ্রের আরামদায়ক অগভীর জল থেকে পৃথিবীর চরমতম গভীরতায় ঠেলে দিয়েছে। এর সবচেয়ে দুর্দান্ত উদাহরণ হলো ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ (Mariana Trench)। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এই খাতটি প্রায় ৩৬,০০০ ফুট (১১,০০০ মিটার) গভীর। এটি এতোটাই গভীর

যে আস্ত মাউন্ট এভারেস্টকে এর মধ্যে ডুবিয়ে দিলেও তার চূড়ার ওপর আরও দুই কিলোমিটার জল থৈ থৈ করবে। এর সবচেয়ে গভীর অংশের নাম ‘চ্যালেঞ্জার ডিপ’ (Challenger Deep)। ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির ‘এইচএমএস চ্যালেঞ্জার’ জাহাজের কর্মীরা একটি ওজন বাঁধা দড়ির সাহায্যে প্রথম এই গভীরতা মেপেছিলেন, আর সেই জাহাজের নাম থেকেই এই জায়গার নাম রাখা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জার ডিপের তাপমাত্রা প্রায় হিমাক্ষের কাছাকাছি, সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছানো একেবারেই অসম্ভব। চ্যালেঞ্জার ডীপে জলের প্রেসার বা চাপ প্রায় আমাদের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ থেকে ১১০০ গুণ বেশি। এই চাপে, কোনো প্রাণীর টিকে থাকাটাই একটি বিশাল বড় আশ্চর্য। এই চাপকে বোঝানোর খুব সহজ উপায় হলো, মনে করা যাক একটি ছোট্ট ডাক-টিকিটের ওপরে পুরো আইফেল টাওয়ারকে যদি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় বা আমাদের মাথার ওপরে যদি পূর্ণবয়স্ক ১০০ হাতিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় সেইরকম। এই কারণে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের ধারণা ছিল যে, ওই ভয়ংকর গভীরতায় কোনো প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। মানুষ চিরকালই অজানা অচেনার প্রতি যে অমোঘ আকর্ষণে ছুটে যায়, সেই রকমই দুই অভিযাত্রী জ্যাকস পিকার্ড (Jacques Piccard) এবং ডন ওয়ালশ (Don Walsh) ১৯৬০ সালে ছুটে গিয়েছিলেন চ্যালেঞ্জার ডিপের অচেনা গভীরের দিকে। যাওয়াটা হয়তো ১৮৭৫-এর খোঁজের পরে ১৯৬০, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল জলের ভেতরের চাপ। সেখানে যাওয়ার জন্য মানুষের ব্যাকুলতার অভাব ছিল না, অভাব ছিল সেই কারিগরি দক্ষতার যা জলের অত্যন্ত চাপকে সহ্য করতে পারে। এনার দুজনেই ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে তারা তৈরি করেছিলেন ‘ট্রিয়েস্ট’ (Trieste) নামের বিশেষ সেই যান যাকে নিয়ে তারা পৌঁছে গেলেন জলের তলায়। ১৯৬০ সালের ২৩ জানুয়ারি, সমুদ্রতলের কাদামাটিতে নামার পর পিকার্ড জানান যে, তিনি দুটি গোল চোখওয়ালা হ্যালিবাট মাছের মতো একটি চ্যাপ্টা মাছ (Flatfish) দেখেছেন। এতো গভীরে মাছের উপস্থিতি জীব-বিজ্ঞানীদের এদের বাঁচার কৌশল নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছিল।

কিন্তু আধুনিক সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান এই দাবিটি সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করেছে। পিকার্ড যে প্রাণীটি দেখেছিলেন, তা কোনোভাবেই মাছ হতে পারে

না। কেন? কারণটা হলো জীববিজ্ঞানের কিছু নিজস্ব সীমা আছে। যেমন মহাকাশে স্পেসসুট ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না, তেমনি ১১,০০০ মিটার গভীরে কোনো মেরুদণ্ডী প্রাণী (যেমন মাছ) বাঁচতে পারে না। সেখানকার প্রচণ্ড চাপে মাছের শরীরের প্রোটিনগুলো এতো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় যে শরীর তা ঠিক করার সময় পায় না। দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী অন্ধকারে চোখের কোনো প্রয়োজন নেই। চ্যাপ্টা মাছেরা শিকার করা বা বালিতে লুকিয়ে থাকার জন্য চোখের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু যেখানে সূর্যের এক কণা আলোও নেই, সেখানে চোখ তৈরি করাটা শরীরের শক্তির অপচয় মাত্র। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন, তাদের সাবমেরিন নামার সময় প্রচুর কাদা ওড়ার কারণে দৃশ্যমানতা কমে গিয়েছিল। সম্ভবত তারা চোখবিহীন গভীর সমুদ্রের সি কিউকাম্বারকে (সমুদ্র শশা) মাছ ভেবে ভুল করেছিলেন।

যদি ১১,০০০ মিটারে সাধারণ মাছ না বাঁচে, তবে মাছের বিচরণ সীমা ঠিক কতোটা? বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মাছেরা মোটামুটি ৮,২০০ থেকে ৮,৪০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বাঁচতে পারোকাউকে যদি এই গভীরতায় টিকে থাকার মতো কোনো প্রাণীর ছবি আঁকতে বলা হয়, তবে হয়তো সে মোটা বর্ম আর ধারালো দাঁতওয়ালা হয়তো কোনো দানবের ছবি আঁকবে। কিন্তু বিবর্তন এর ঠিক উল্টো পথে হেঁটেছে। এই চরম সীমানায় টিকে থাকে এক অদ্ভুত প্রাণী— হ্যাডাল স্নেইলফিশ (Hadal snailfish)। ৬,০০০ থেকে ৮,০০০ মিটারের বেশি গভীরতায় বাস করা ম্যারিয়ানা স্নেইলফিশ—কে দেখলে মনে হবে এটি খুবই দুর্বল। এটি ফ্যাকাশে, পুরোপুরি স্বচ্ছ, আঁশবিহীন এবং দেখতে অনেকটা বড় ব্যাঙাচির বা জেলির মতো। এর চামড়ার ভেতর দিয়ে ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও দেখা যায়। অথচ, এই চরম গভীরতায় এরাই হলো শীর্ষ শিকারী! একটি খালি টিনের কৌটো এবং একটি জল ভর্তি বেলুনের কথা ভাবা যাক। বন্ধ টিনের কৌটোটি সমুদ্রের গভীরে নিয়ে গেলে প্রচণ্ড চাপে দুমড়ে মুচড়ে যাবে। কিন্তু জল ভর্তি বেলুনটিকে নিচে নিয়ে গেলে তার কিছুই হবে না। কারণ জল সংকুচিত হয় না। স্নেইলফিশ এই চরম গভীরে বেঁচে থাকে কারণ তার শরীর অত্যন্ত নরম, নমনীয় এবং পুরোপুরি জলে পূর্ণ।

অভ্যন্তরীণ রূপান্তর দ্বারা জীবন সংগ্রাম জয়ের গল্প :-

এই ভয়ংকর চাপে টিকে থাকার জন্য গভীর সমুদ্রের প্রাণীদের নিজেদের কোষের ভেতরে



নানা পরিবর্তন আনতে হয়েছে: মাইক্রোস্কোপিক বাবল র‍্যাপ (Chemical Water-Shields): প্রোটিন হলো জীবনের মূল ভিত্তি। প্রচণ্ড চাপে জলের অণুগুলো স্বাভাবিকের থেকে বেশি কাছে চলে আসে যা প্রোটিনকে পিষে ফেলে, ভালো করে বললে কোষের কাজ বন্ধ করে দেয়। এটি ঠেকাতে এই প্রাণীদের কোষে ‘পিয়েজোলাইট’ (piezolytes) নামের একধরনের রাসায়নিক থাকে। এটি প্রোটিনের চারপাশে একটি ঢাল তৈরি করে, ঠিক যেমন কাঁচের জিনিসকে ‘বাবল র‍্যাপ’ (Bubble wrap) দিয়ে মুড়ে সুরক্ষিত রাখা হয়। এই রাসায়নিকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ট্রাইমিথ্যালামিন এন-অক্সাইড Trimethylamine N-oxide (TMAO)। বিশেষ চর্বির উপস্থিতি: কোষের বাইরের আবরণ বা মেমব্রেন হলো ঘরের দরজার মতো, যা দিয়ে শরীরে পুষ্টি ঢোকে। চরম চাপ এবং ঠান্ডায় সাধারণ ফ্যাট বা চর্বি মাখনের মতো জমে শক্ত হয়ে যায়, সেইরকম ভাবে কোষের আবরণের ফ্যাট বা চর্বি জমে যায়, ফলে কোষের দরজা খোলেনা, কোষ না খেতে পেয়ে মারা যায়। তাই এই প্রাণীদের কোষে এমন ফ্যাট থাকে, যা এই ভীষণ চাপে ও ঠান্ডাতে জমে যায়না, ফলে কোষ তার স্বাভাবিক বিপাকীয় কাজ চালিয়ে যাতে পারে এবং পুষ্টি কোষের ভিতর ঢোকে। হাড় বর্জন: গভীর সমুদ্রের চাপে সাধারণ হাড় দ্রুত ভেঙে যায়। তাই স্নেইলফিশের মতো প্রাণীদের শক্ত হাড়ের বদলে অনেকটা নরম তরুণাস্থি (cartilage) থাকে। এমনকি চাপ যাতে দ্রুত সমান হতে পারে, তাই এদের মাথার খুলিতেও ফাঁক থাকে।

চাপ সহ্য করার জন্য জিনগত অভিযোজন :-

গভীর সমুদ্রের এই মাছ এবং তার অগভীর জলের আত্মীয়দের জিনোম (সোজা ভাষায় বললে - সম্পূর্ণ ডি.এন.এ) তুলনা করে বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট কিছু জিনগত পরিবর্তন বা মিউটেশন খুঁজে পেয়েছেন, যা তাদের কঙ্কালের এই বিশেষ গঠনের জন্য দায়ী: সাধারণ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শরীরে ‘BGLAP’ নামের জিনটি (যা অস্টিওক্যালসিন নামেও পরিচিত) টিস্যুতে খনিজ জমা করতে এবং নরম তরুণাস্থিকে (কার্টিলেজ) শক্ত হাড়ে রূপান্তর করতে সাহায্য করে। কিন্তু স্নেইলফিশ মাছের এই জিনটিতে একটি বিশেষ ক্রটি (ফ্রেমশিফট মিউটেশন) রয়েছে। এই ক্রটির কারণে প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়াটি মাঝপথেই থেমে যায় এবং জিনটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে মাছটির হাড় শক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি শুরুতেই বন্ধ হয়ে যায় এবং এর পুরো কঙ্কালটি নরম, নমনীয়

তরুণাস্থি হিসেবেই থেকে যায়—যা সমুদ্রের প্রচণ্ড চাপ সহজে সহ্য করতে পারে। ফলে এই মাছের মাথার খুলির হাড়গুলো একে অপরের সাথে পুরোপুরি জোড়া লাগে না। যদি এদের মাথার খুলি সাধারণ প্রাণীদের মতো শক্ত হতো, তবে গভীর সমুদ্রের চাপে সেটি দুমড়ে-মুচড়ে যেত। খুলির মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকার কারণে মাথার ভেতরের ও বাইরের জলের চাপ সমান থাকে। যা প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও এদের মস্তিষ্ক সুরক্ষিত রাখে। অথচ মজার বিষয় হলো, পুরো কঙ্কালটি নরম তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি হলেও, এই মাছের দাঁত এবং কানের ভেতরের ছোট হাড়গুলো (otoliths) কিন্তু ঠিকই শক্ত হাড়ে রূপান্তরিত হয়। এটি প্রমাণ করে যে তাদের শরীরে অত্যন্ত নিখুঁত জিনগত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যার ফলে মাছটি গভীর সমুদ্রেও দাঁতের সাহায্যে শিকার ধরতে পারে এবং শব্দের কম্পন অনুভব করতে পারে। সমুদ্রের তলদেশের মারিয়ানা ট্রেঞ্চের মতো গভীর অঞ্চলের প্রাণীদের (যেমন- ডীপ-সী স্নেইলফিশ) সাধারণ মাছের মতো সাঁতার কাটার হাওয়ার থলি বা ‘সুইম ব্ল্যাজার’ থাকে না। যদি তাদের শরীরে কোনো ফাঁপা বায়ুথলি থাকত, তবে সমুদ্রের তলদেশের প্রচণ্ড চাপে (যা ভূপৃষ্ঠের চেয়ে প্রায় ১,০০০ গুণ বেশি) সেই বায়ুথলি সঙ্গে সঙ্গে দুমড়ে-মুচড়ে যেত এবং প্রাণীটি মারা যেত। তাই ট্রেঞ্চের প্রাণীদের কোনো হাওয়ার থলি নেই। এদের শরীর পুরোটাই তরলে ভরা। ভেতরের তরলের চাপ এবং বাইরের জলের চাপ সমান হওয়ায় এদের শরীর কখনো পিষে যায় না। এরা একদম পারফেক্ট ব্যালেন্সে থাকে।

তলদেশের জীবন- ১১,০০০ মিটারের দুনিয়া : মাছেরা ৮,৪০০ মিটারের পর আর না থাকলেও, চ্যালেঞ্জার ডিপের ১১,০০০ মিটার তলদেশেও প্রাণের স্পন্দন রয়েছে। এখানে ব্যাকটেরিয়া এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের এক অদ্ভুত জগত গড়ে উঠেছে। এখানে সূর্যের আলো নেই বলে কোনো গাছপালাও নেই। এদের খাবার আসে ওপর থেকে। সমুদ্রের ওপর থেকে মৃত প্ল্যাঙ্কটন বা মাছের দেহাংশ বরফের মতো নিচে ঝরে পড়ে, যাকে বলা হয় ‘মেরিন স্নো’ (Marine snow)। সমুদ্রের তলদেশে ঘুরে বেড়ায় অ্যামফিপড (Amphipods) নামের চিংড়ির মতো দেখতে ছোট ছোট প্রাণী, যারা মূলত ঝাড়ুদারের কাজ করে। খাবার পেলেই এরা দলে দলে ছুটে আসে। ‘সুপারজায়ান্ট অ্যামফিপড’ নামের একটি প্রজাতি প্রচণ্ড চাপ থেকে বাঁচতে দারুন একটি

কেমিক্যাল ম্যাজিক দেখায়। এরা সমুদ্রের কাদা থেকে অ্যালুমিনিয়াম সংগ্রহ করে নিজেদের খোসায় একটি জেলের মতো বর্ম তৈরি করে নেয়। অর্থাৎ কাদা থেকেই এরা নিজেদের বর্ম বানায়!

এছাড়াও রয়েছে জেনোফায়োফোরস (Xenophophores), যাঁরা এককোষী হলেও মানুষের হাতের মুঠোর সমান বড় হতে পারে। ক্যালসিয়াম দিয়ে খোলস বানালে তা গলে যাবে বলে এরা সমুদ্রের কাদা আর বালি দিয়ে নিজেদের জন্য দারুণ সব খাঁচা তৈরি করে, যার ভেতর এরা সুরক্ষিত থাকে।

ট্রেঞ্চের ফাটল দিয়ে পৃথিবীর ভেতর থেকে যে গরম রাসায়নিক পদার্থ বেরিয়ে আসে (হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট), তাকে কাজে লাগিয়ে একধরনের বিশেষ ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকে। এরা সূর্যালোকের বদলে পৃথিবীর ভেতরের রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করেই খাবার তৈরি করে (যাকে কেমোসিন্থেসিস বলে)।

আমরা-ওরা এক অদৃশ্য সংযোগ:

আমরা প্রায়শই ভাবি ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ হয়তো অন্য কোনো গ্রহের মতো আমাদের জগত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মনে করি, পৃথিবীর একদম নিচে বাস করে এই প্রাণীরা বোধহয় মানুষের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বেঁচে গেছে। কিন্তু বাস্তবতা অত্যন্ত নির্মম এবং এটি আমাদের পৃথিবীর সাথে তাদের সরাসরি জুড়ে দেয়।

ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের ভৌগোলিক গঠন অনেকটা ফানেলের মতো। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে ওই স্থানে যা কিছুই ডোবে, তা গড়িয়ে এর তলদেশে গিয়ে জমা হয়। আর এটিই পৃথিবীর গভীরতম স্থানকে গ্লোবাল দূষণের ডাস্টবিনে পরিণত করেছে। যে বৈশিষ্ট্যগুলো এই প্রাণীদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছিল, আজ সেগুলোই তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খাবারের অভাবে এরা যা পায় তাই খেয়ে নেয়। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা চ্যালেঞ্জার ডিপ থেকে সংগ্রহ করা ৭২ শতাংশ অ্যামফিপডের পেটে মাইক্রোপ্লাস্টিক এবং সিন্থেটিক ফাইবার (যেমন রেশম) পেয়েছেন। এছাড়া মানুষের কলকারখানা থেকে তৈরি হওয়া মিথাইলমারকারির মতো বিষাক্ত ভারি ধাতুগুলো সমুদ্রের গভীরে গিয়ে অ্যামফিপডদের শরীরে ঢুকছে। অ্যামফিপডদের খাচ্ছে স্নেইলফিশ। আর এভাবেই আমাদের তৈরি করা বিষ গভীর সমুদ্রের খাদ্যশৃঙ্খলে চিরকালের জন্য ঢুকবে পড়ছে। চ্যালেঞ্জার ডিপ প্রমাণ করে যে জীবন কতোটা লড়াকু এবং সহনশীল। কাদা থেকে

অ্যালুমিনিয়ামের বর্ম বানানো হোক বা কেমিক্যাল বাবল র্যাপ দিয়ে প্রোটিনকে বাঁচানো—শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য প্রকৃতি কতই না আশ্চর্য ঘটাতে পারে। কিন্তু ৩৬,০০০ ফুট গভীরে বাস

করা একটি প্রাণীর পেটে যখন মানুষের ব্যবহৃত সিঙ্গেটিক জামার টুকরো পাওয়া যায়, তখন আমরা একটা বড় সত্য উপলব্ধি করতে পারি। পৃথিবীতে আমাদের, মানুষ নামক প্রাণীর, আরো

অনেক বেশি দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। গভীর সমুদ্রের এই অদ্ভুত প্রাণীরাও আমাদেরই পৃথিবীর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা যতই দূরে থাকি না কেন, আমরা সবাই একই পৃথিবীর বাসিন্দা।



পাপড়ি মেলে দিয়ে আবার ভোরে ঝরা বকুল— অর্ঘ্য চট্টপাধ্যায়ের ক্যামেরায়



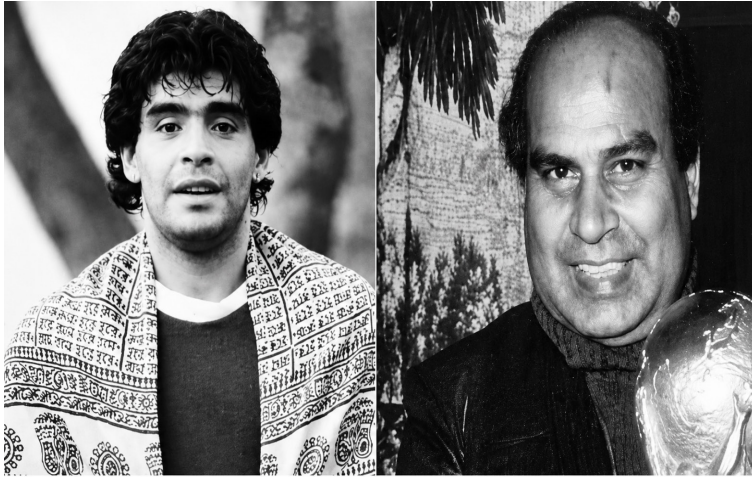
ধাঁধার থেকেও জটিল তুমি— অর্ঘ্য চট্টপাধ্যায়ের ক্যামেরায়

মালদা থেকে মেক্সিকো, মারাদোনা থেকে মুক্তিযুদ্ধ- সবটাই তাঁর ক্যামেরায় বিস্মৃত আলোকচিত্রী অমিয় তরফদার

ঋষি ঘোষ

২০২০তে কিংবদন্তি ফুটবলার মারাদোনার প্রয়াণ এবং বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় নামাবলী গায়ে দেওয়া মারাদোনার একটি ছবি ভাইরাল হয়ে ওঠে। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না মারাদোনার এই বহু আলোচিত ছবিটি যে চিত্রসাংবাদিক তুলেছিলেন, তার সঙ্গে মালদার একটা যোগাযোগ ছিল। ভুলে যাওয়া সেই আলোকচিত্রীর নাম অমিয় তরফদার।

অমিয় তরফদারের জন্ম দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে। প্রাথমিকভাবে দিনাজপুর ও মালদা জেলা জুড়ে চিত্র সাংবাদিকতার হাতে খড়ি হয় তাঁর। ১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হিলি বর্ডার পেরিয়ে তিনি চলে যান ওপার বাংলায়।



যুদ্ধের মাঝখান থেকে আরম্ভ করে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের ধানমন্ডির বাড়ির প্রেস কনফারেন্স পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস পুরোটাই ধরে রাখা আছে অমিয় তরফদারের ক্যামেরায়। ২০০৬ এ তাঁর প্রয়াণের পর ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একক প্রদর্শনীর স্বীকৃতি এই বিস্মৃত আলোকচিত্রীর প্রতিভার একটা দিক উপস্থাপিত করে মাত্র।

পাকিস্তানি বোমাবর্ষণে নিহত মুক্তিফৌজের মৃতদেহ বহন করা হচ্ছে সাইকেল রিক্শায়, এই ছবি যেমন আন্তর্জাতিক মহলে মুক্তিযুদ্ধের আইকন হয়ে উঠেছিল- তেমনি সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গোটা নয় এর দশক জুড়ে

খেলার জগতের পেশাদার আলোকচিত্রশিল্পী মানেই অমিয় তরফদার।

ততদিনে বালুরঘাটের নিজস্ব বাড়ি এবং মালদার ভাড়াবাড়ি ছেড়ে স্থায়ীভাবে দক্ষিণ কলকাতার গল্ফগ্রিন তৈরি হয়েছে তাঁর নিজস্ব স্টুডিও

এবং বাসস্থান। ২০১৫ সালের ২১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের গণমাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে প্রয়াত অমিয় তরফদারের ভাই শেখর তরফদার, যিনি নিজেও একজন প্রতিষ্ঠিত আলোকচিত্রশিল্পী, স্পষ্ট ভাষায় বলেন- প্রায় তিন দশক ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের কোন পত্রপত্রিকা বা কোন সংবাদ সংস্থা বাদ নেই, যেখানে অমিয় তরফদারের ছবি ছাপা হয়নি। তা পি টি উষার পদক জয় থেকে শুরু করে ফুটবল বিশ্বকাপ হোক বা মিলখা সিং এর শেষ দৌড় থেকে শুরু করে ভারতের প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়-সবটা জুড়েই তিনি আছেন। তাঁর কথা মনে করতে পারেন মালদার বর্ষীয়ান

সাংবাদিক অভিজিৎ চৌধুরী। নয়ের দশকের গোড়ায় প্রথম আলাপেই তাকে বেশ কিছু ফটোগ্রাফির সামগ্রী উপহার দিয়েছিলেন অমিয় তরফদার। তরুণ অভিজিৎ তখন চিত্র সাংবাদিক হিসেবে নিজের কর্মজীবন শুরু করেছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর স্নেহময় উপদেশ। অভিজিৎবাবু এখনো মনে করতে পারেন- এই পেশায় টিকে থাকার জন্য যে বিপুল শৈথর্যের প্রয়োজন; তা তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন প্রবীণ অমিয়বাবু। ইন্টারনেট পূর্ববর্তী যুগে ছবি তোলায় পর 'কাটারিল' পাঠানোর কৃৎকৌশল রপ্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি- সেটাও আয়ত্ত করার উপদেশ দিয়েছিলেন। স্থিরচিত্রের ব্যাকরণে ফ্রেমিং যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়; সেদিকে নজর দেওয়ার বিষয়টিও তরুণ অভিজিৎকে কাছে জোর দিয়ে

প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

ইংরেজবাজারের পুরাতন দমকল অফিসের কাছে যে বাড়িটিতে তিনি ভাড়া থাকতেন বা বালুরঘাটের বাসভবন আজ অবলুপ্ত। অথচ কুইকার বা নিউজির মতো আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার ওয়েবসাইটে অলটাইম গ্রেটদের তালিকায় সবসময় জ্বলজ্বল করে তাঁর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে তোলা অসামান্য ফোটোগ্রাফগুলি। এই শহর কি পারে না সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহ এই বিস্মৃত আলোকচিত্রীর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে? যাতে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই সত্যটা উঠে আসবে- ক্যামেরা দিয়েও ইতিহাস লেখা যায়।

উত্তর খোঁজার সময় এসেছে।

ইমন ভট্টাচার্যের কবিতা

দূরত্ব

তোমাকে পেয়ে আমি আবার একা হয়ে নিলাম।
 চলে গেলাম সূর্য পেরিয়ে নক্ষত্র পেরিয়ে দূরে।
 এত দূর সেই বিচ্ছিন্নতার সীমারেখা
 নিজেরও ভয় করছিল
 কিন্তু উঠে আসছিল কবিতা।
 উঠে আসছিল গান,
 উঠে আসছিল সময়হারা সুর।
 তুমি আছ তোমার জগতে,
 আমি আছি আমার সঙ্কটে
 দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে,
 দুইহাত দূরের মানুষ ও আর চেনা যায়না।



সুস্বাদ এক অন্ধকার

অনেকদিন পর সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করছি।
 ভাবছি এবারের সূর্যপর্ব কেমন হবে।
 কেউ তো নেবেনা কাছে ডেকে।
 বহু কথা বলার ছিল, সেসব কেউ জানতেও
 চাইবেনা।
 তবু এই অপেক্ষা
 কাক ডাকার আগের অন্ধকার।
 বিরাম, অন্ধকার ও অপেক্ষা।

“কেউ নেই শূন্যতা”-র জাদুকর

শিবাজী লাহিড়ী

১.

“তাকে আমি আনফ্রেন্ড করছি। তুই আর আমাকে ফোন করবি না। যতদিন নিজে না লিখতে শিখছিস, ততদিন তোর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ থাকবে না।” দ্বিতীয় কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ফোনটা কেটে দিল রঞ্জনদা। ততদিনে আপনি থেকে তুমি সম্বোধনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। রঞ্জনদাও তুমি থেকে নেমে এসেছেন তুইয়ে।

কে ছিলেন রঞ্জন ঘোষাল? মহীনের ঘোড়াগুলির প্রাথমিক পর্বের এক ঘোড়া? নাকি, এমসি? নাকি মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে উচ্চ শক্তির বিভবে আবিষ্ট এক ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার? নাকি অসম্ভব ভালো, গীতিকার, সুরকার? সফল ব্যবসায়ী? না। এগুলির কোনোটাই রঞ্জনদাকে ডিফাইন করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাঁর নিজের ভাষাতেই, “...বহু ঘাটের সুপেয় দুপ্পেয় জল খেয়ে আমি এসে পৌঁছেছি...” রঞ্জনদার সঙ্গে আমার আলাপ অবশ্য এই ঘটনার বেশ কয়েকবছর আগে। ২০১৭ সালে।

সন্ন্যাস না সংসার! নাকি সংসারী সন্ন্যাসী... কোন মার্গে পা ফেললেই মিলবে মুক্তি, তা তখনও অধরা। সেসময় ব্রহ্মচর্যা সীমাবদ্ধ ছিলো মূল ১৮টি উপনিষদ, কিছু বুদ্ধিষ্ট টেক্সটের মধ্যেই। অথচ মনে প্রশ্নের আন্দোলনে, আমি দিশেহারা। তত্ত্বত ব্রহ্মের যে ধারণা প্রচার ও প্রসার করা হয়, তার নীতিগত ভিত্তি নিয়ে মনে একাধিক প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। মূল কারণ অবশ্যই অনুভবের সীমাবদ্ধতা। তবে সেই সীমাবদ্ধতাকে আমি মানতে নারাজ। কারণ ব্রহ্মচর্যা একধরনের সুপেরিওরিটি কমপ্লেক্সের জন্মও দেয়। সেই সুপেরিওরিটি কমপ্লেক্স ভরসায় আমি তখন নিজেকে তত্ত্বজ্ঞ ভাবতেই শুরু করেছি। কিন্তু তখনও কোনটা ইনস্টেনশিয়শন ও কোনটা পার্মানেন্ট, তার ধারণাই পরিষ্কার হয়নি।

তসলিমা নাসরিন আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড। হয়তো আরও অনেকেরই হবেন। কিন্তু আজকে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তসলিমা নাসরিন না থাকলে কখনোই রঞ্জনদার সঙ্গে আমার আলাপটুকুও হত না। তসলিমা নিজেও হয়তো জানেন না সেই কথা। একদিন কোনও এক পোস্টে রঞ্জনদাকে ট্যাগ করেন। সেই পোস্ট ধরেই রঞ্জনদার প্রোফাইল ভিজিট। খানিকটা সাহসে ভর করেই, পাঠিয়ে দিলাম ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট। খুব বেশি হলে কী হবে?— রঞ্জন ঘোষাল ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট একসেপ্ট করবেন না। কিন্তু রঞ্জন ঘোষালকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে তোমার একটুও ভয় করল না শিবাজীদা? জিজ্ঞেস করেছিল, আমার এক ভাই। ওকে যা বলেছিলাম, তাও রইল পাঠকদের



জন্য।

২০০৬ সালে অনুরাগ বসুর পরিচালনায় মুক্তি পেল গ্যাংস্টার। মূল ভূমিকায় সাইনি আছজা ও কঙ্গনা রানাওয়াত। কিন্তু সিনেমা যতটা না টানলো, তার চেয়ে বেশি টানলো, জেমস এর গলায় ভিগি ভিগি...—এর সুর। মফস্বলের একটি ছেলে তখন গিটার বাজিয়ে নিজের লেখা গান গাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। সাহিত্যচর্চার পরিবেশ মধ্যবিত্ত চাকুরিরত পরিবারের একটি আবশ্যিক শর্ত তখনও। সেই সাহিত্য চর্চার উঠোন দিয়ে চুপ করে ঢুকে পড়লেন, রঞ্জন প্রসাদ। চিত্তরঞ্জন দাশের আত্মীয়, রঞ্জন প্রসাদের লেখনীতেই প্রথম জানলাম, রঞ্জন ঘোষালের নাম।

“আমরা ট্রাইও তিনজন/ ধূর্জটি বুলা আর রঞ্জন।”—মহীনের ঘোড়াগুলির আগেও, যে একটা প্রাইমারি স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছিল, তা জেনেছিলাম রঞ্জন প্রসাদের লেখাতেই। ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায় এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। জলশন্দের কেন মালবিকা প্ররোচিত হয়েছিল, তার প্রশ্ন তুলে লিখে ফেলেছিলেন একটি কাব্যগ্রন্থই। কিন্তু সেই কাব্যও যখন উত্তর দিতে পারল না, দ্বন্দ্বের নিরসন হলই না কোনোভাবে, ধূর্জটি নিজেই জলশন্দের প্ররোচিত হতে পা বাড়ালেন। অনন্তের পথে। রঞ্জনদা তাঁর আত্মজীবনী ‘অজানা উড়ন্ত বই’—এ লিখেছিলেন ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে “...আমরা কয়েকজন হটোর স্টেশন—এ গিয়ে নামি। দেখি খালটা অদৃশ্য। ওখানকার জনতা.. তার জানেই না ওখানে ছিলো একটি স্রোতস্বিনী, বহুতা জলপথা... কী করে হঠাৎ হারিয়ে গেল একটা জলজ্যন্ত নদী? এবং ঠিক কী করে চলে গেল একটি আদ্যন্ত রোমান্টিক মানুষ— ধূর্জটি?” তখনও এত কিছু জানি না। জানি একদিন ঠিক গান গাইব। নিজের লেখা, নিজের সুর করা গান। সবাইকে শুনতে হবে না অবশ্যই। একজন দুজন শুনলেই আমার চলবে।

২.

“ঘরে আমার কোনোদিনই মন টেকেনি।”—এই লাইনগুলোই কি যথেষ্ট নয়, যে লোকটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে, তাঁকে আরও বেশি করে, অনন্তের পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য? সেই অভিঘাতে জর্জরিত হতে হতেই, একদিন রঞ্জনদা মেসেজ করলেন, “এইসব ধারণা সাধারণের জন্য নয়। শ্যালারা ভয় পেয়েছে। তা এগুলো কি নিজের অভিজ্ঞতা?” আমি তখন খুঁজছি জাস্টিফিকেশন। তবু আমাকে মোহাবিশ্ট করছে। আমি তাত্ত্বিক শিক্ষার দার্শনিক অভিঘাতে রীতিমত ছিন্নবিচ্ছিন্ন। একের পর এক তাত্ত্বিক টেক্সট পাগলের মতো

পড়ছি। গুহাসমাজ তন্ত্র, চণ্ডমহারোষণা তন্ত্র। সন্ধ্যা থেকে রাত কাটছে শ্মশানে। জন্মমৃত্যুর ডাইস্পারা বোঝার চেষ্টায় কালাতিপাত করতে করতেই মাঝেমধ্যে লিখে ফেলছি একটা দুটো তত্ত্বের এলাবরেশন। সেই কোনও এক তত্ত্বের এলাবরেশন মনে ধরেছিল রঞ্জনদার। আমি কর্মবাদ মানি না। আজকেও না। তখনও না। কর্মফলেও আমার সবিশেষ বিশ্বাস নেই। বরং কর্মবাদকে সমাজের এলিট শ্রেণির শাসনযন্ত্র হিসেবেই মনে করি। তবে আজকে যে জোরের সঙ্গে কর্মবাদ মানি না বলতে পারছি, তখন সেই জোর আমার ছিলো না। ছিলো জাস্টিফিকেশন খোঁজার খোয়াব। আমার লেখা কেউ পড়ছে কিনা— এই দ্বন্দ্বকে আমি কাস্টের প্রায়োরি, পোস্টেরিয়রি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছি। মহাকাশ গবেষণা চলে গিয়েছে কোন গাধার ইয়েতো। আমি লিখেছিলাম, এইসব কেউ পড়ে না। আর কাউকে পড়তেও হবে না। আমি লিখি। তার উত্তর রঞ্জনদা দিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, নিজের অভিজ্ঞতাসম্পত্তি জ্ঞান কিনা! বলেছিলাম, হ্যাঁ। কিন্তু জহুরি চেনেন জহুরি। বলেছিলেন, কোনও বাস্তবী আছে? আমি অব্যবহিত। রাস্তায়ঘাটে ঘুরে বেড়ানো পাগলের বাস্তবী কেই হয়? লিখলাম, কেউ নেই। আগামীতেও কাউকে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখছি না। খেঁকিয়ে উঠে রঞ্জনদা বললেন, সঙ্গিনী ছাড়া এইসব হয় নাকি? বিমুগ্ধ, বিমোহিতা বাস্তবী না পেলে এসব করে লাভ নেই। তুই যা বুঝছিস, সেটা সবটাই ওপর ওপর। তত্ত্বের অতলে তলাতে গেলে, একজন সঙ্গিনী প্রয়োজন। প্রপার সঙ্গিনী না জুটলে, এইপথে এসে কিছই হবে না। তখনও সঙ্গিনী জুটতে বাকি দুই বছর।

৩. আমি ততদিনে গুরুর লেখনী দ্বারা পুরোই আবিষ্ট। রঞ্জনদা ততদিনে আমার গুরু হিসেবে মনোময় কোষে প্রতিষ্ঠিত। কারণ, আমি যে ওয়াভলেংথে ভাবি, গুরু সেই ওয়াভলেংথেই নিজের ভাবনাকে শব্দে রূপ দেন। শাস্ত্র বলে, গুরু আর শিষ্যের রাস্তায় প্রভেদ থাকে। কিন্তু আমি কুশলানুশিষ্ট শিষ্য নই। বরং অনুশাসনের তোয়াক্কা কোনোদিনই করিনি। ফলে ভেবে ফেলেছিলাম, যাহাই গুরুর পথ, তাহাই আমার পথ। গুরুর রাম ধাতানি খেয়ে সম্মিত ফিরেছি। কিন্তু তার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে।

শান্তিনিকেতনের একটি কুটির স্টাইল বাংলা। কাশ্মীরাকে নিয়ে যখন ঢুকলাম, ঘড়ির কাঁটা

১২ টা ঘর পার করেছে। কাশ্মীরা, আমার কাছে নিরন্তর গুরুবন্দনা শুনেছে। কীভাবে আলাপ, কীভাবে সম্পর্কের গতি ধীরে ধীরে গুরু শিষ্যের সম্পর্কে পরিণতি লাভ করেছে। গুরুদেব কাউচে গা এলিয়ে ছিলেন। আমাদের ঢুকতে দেখে উঠে বসে কাশ্মীরাকে বললেন, বা তোকে তো ভারী সুন্দর দেখতে। ততদিনে আমি একটু একটু করে জীবন সমুদ্রে নিজ সিদ্ধান্তে পাল তুলতে শুরু করেছি। এর মাঝখানেই এলো ফোন। স্বপনদা, রঞ্জনদার দাদার। বেশ খানিকক্ষণ ফোনে, আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাঙ্গত্ব, ও শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মতবাদ নিয়ে আলোচনা শুনলাম। সেও এক শিক্ষা বটো। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতকে যদি, রূপ, রস ও গন্ধহীন বলে প্রতিভাত হয়, তবে রামানুজের বিশিষ্টাঙ্গত্ব সেখানে কেবলই প্রেম। গুরুদেব নিজেও মনে করতেন, বলতেনও— ঈশ্বর নেই। আছে শুধু তাঁর প্রেমটুকু। অপেয়, দুস্পেয় জল খেতে খেতে ট্রেনের কামরায় বসে কালবেলিয়া সাধকের থেকে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, সেই জ্ঞান ছড়িয়ে দিলেন আমাদের মধ্যে। ওই ঘরে তখন উপস্থিত কাশ্মীরা, নয়নদা, পারিজাত ও আমি। ফোনটা রাখলেন এই বলে, “আমার সামনে একজন এমন ছেলে বসে রয়েছে, যে নিজেকে তন্ত্রসাধক ভাবে। ফেক তন্ত্রসাধক। আমাকে একটু ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।” বাঁশি শুনতে চেয়েছিলেন। ততদিনে নিজেকে পরিচিত করিয়েছি, সদাশিব ভৈরব হিসেবে। আর কাশ্মীরা ভৈরবী অন্নপূর্ণা। বলেছিলাম, মালদায় এসো। কোভিড মিটলে। আসার কথাও ছিলো।

কিন্তু নিরীশ্বরতার সাধনার ভূত যাঁর মাথায় চাপে, তিনি কীভাবেই বা আর অপেক্ষা করতে পারেন? ৪.

রঞ্জন ঘোষালের জীবনকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করতে পারি। যে লোকটা চিরকাল লকড়ি, তৈজস, তণ্ডুলের মায়া থেকে দূরে থাকতে চেয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন, সেই লোকই আবার কোন রান্নায় কী ফোড়ন প্রয়োজন, তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। যে লোকটা মহীনের ঘোড়াগুলির চূড়ান্ত সময়ে কলকাতার নকটানাল জীবনকে ধুমুকলিকা ও কারণে সিঞ্চিত দেখেছেন, সেই লোকটাই নয়নদাকে দিয়ে সিগারেট ছাড়িয়েছেন। রঞ্জনদার একদিকে যদি জীবনের উচ্ছ্বাসের তীর হাতছানি থাকে, তবে অন্যদিকে রয়েছে উদাসীনতার মূর্ত অভিব্যক্তি। রঞ্জনদার নিজের ভাষাতেই, সে বড় দ্বন্দ্বের সময়। সে বড় ক্ষোভের সময়, সে বড় প্রেমের

সময়। আচার্য নাগার্জুন তাঁর মূলমধ্যমক কারিকায় নির্বাণ পরীক্ষা করতে গিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, “সংসার নির্বাণে নেই সে প্রভেদ/ যাহাই সংসার জেনো নির্বাণও অভেদ।” রঞ্জনদার জীবনের বৈপরীত্য নাগার্জুনের সেই তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করে। একের পর এক লিরিক্সে রঞ্জনদা সেই প্রভাবটা প্রতিমুহূর্তে ছেড়ে গিয়েছেন। “রানওয়ে জুড়ে পড়ে আছে শুধু কেউ নেই শূন্যতা”— এই “কেউ নেই শূন্যতা”— একটি অ্যাডজেকটিভের মতো ব্যবহৃত হয়ে কাঁধে চুল এলোমেলো কিশোরীর উপস্থিতির যে বর্ণনা তুলে ধরে, তা নাগার্জুনের সংসারই নির্বাণ— এই তত্ত্ব ব্যতিরেকে আর কী? অথবা, “আকাশে ভেসেছে বাঁশি সুর, আঁচলে উড়েছে ময়ূর” থেকে নেমে আসছে “যেখানে চূর্ণ ফুল, বারে তার কাফনে”— জীবনমৃত্যুর এই উদযাপন, সাইমলটেনিয়সলি, একই মনোতনিত, এই অভিব্যক্তি বাংলা লিরিক্সের জগতে একমাত্র রঞ্জন ঘোষালই দিতে পেরেছেন— সফল ভাবে। এনিয়ে কোনও দ্বিমত থাকার প্রয়োজন বা জায়গা কোনোটিই নেই। সেই একই প্রয়োজন নেই, তাঁর জীবনের ভালো বা মন্দ ঘটনার পর্যায়ক্রমিক বিবরণেও। জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমার দাঁড়িটা ঠিক কবে তোমার মতো হবে, এবং আমিও কবে ঠিক তোমার মতো রং করে কামস্কাটকা থেকে কাঠমান্ডু এলিয়েনের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াব? রঞ্জনদা ফোঁস করে নিশ্বাস নিয়ে বললেন, “তুই তো বাংলা লিখতেই জানিস না রে। এত বানান ভুল। শোন অন্নপূর্ণা, এই ছোঁড়া একেবারেই বাংলাটা জানে না। তুই ওর প্রতিটি লেখা আগে পড়বি। এডিট করবি। তারপর গিয়ে সম্মতি জানাবি। পরক্ষণেই আমার দিকে ধ্যে এলো অগ্নিবান। যে সামান্য চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার জানে না, তাঁর বাংলা লেখাই উচিত না।” আসলে হবে দাড়ি, কিন্তু লিখেছি দাঁড়ি। অতয়েব গুরু আমার রীতিমত রুগ্ন। সেই সময় ওঁকে কোনরকমে আমি ফের বাংলা ব্যকরণ শুরু থেকে পড়ব, কথা দিয়ে নিরন্তর করেছিলাম। আজও গুরু আসেন। শয়নে স্বপনে, নিশিজাগরণে। ভুলের ঠেলায় যখন চোখে রীতিমত সর্ষেফুল দেখতে শুরু করি, গুরু এসে সন্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। মাঝেমধ্যে হাতের লাঠিটা জোরে জোরে ঠোকে। ঠিক যেভাবে জঙ্গলের সাপ তাড়াতে সাপুড়ে লাঠি ঠোকে। ভ্রান্তির সর্পদোষ কাটাতে গুরুও লাঠি ঠোকে। ভালো থাকো রঞ্জনদা। অন্তত যতদিন আমাদের মোলাকাত না হচ্ছে।

আগমনী ২০২৬

